তনুমন

অমরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

ডি.এম.লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট • কলিকাতা - ৬

অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, বিধান সরণী (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট) কলিকাত
হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স ৮৩
বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীরণজিৎ কুমার সামুই দ্বারা মুদ্র

মনোতোষ ভাস্বতী

সুসন্তানেষু

দিনের বেলায় রাতের অন্ধকার। এমনি রাত নয়, একেবারে অমাবস্যার রাতের মতো। নিরেট আঁধারে ছুঁচগলা-ফাঁক নেই কোথাও একটু। গা ছম ছম করে। চারধারে থমথমানি ভাব। যতো এগুনো যাচ্ছে, ততো যেন গলা টিপে ধরছে. যমদূতের মতো পথ-আগলানো গাছের সারি নিয়ে দুর্ভেদ্য ঘন জঙ্গল।

পুবদিকে দ্বৈতারী আর দক্ষিণে মহাগিরি পাহাড়! পূর্বদিকটায় দুটি পাহাড় গলায় গলা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে। দ্বৈতারীর কোল ঘেঁষে দামসাল নালার জল বয়ে চলেছে তিরতিরিয়ে।

দ্বৈতারী মহাগিরির কোলে বিরাট জঙ্গল। হিংস্র শ্বাপদ বাঘ-সিংহ থেকে নিরীহ হরিণ পর্যন্ত ঘোরাফেরা করছে। বন্দুক রাইফেল পিস্তল ছাড়া এক পাও এগুনো মোটেই নিরাপদ নয়। জীবন হাতে নিয়ে কাজ করা এখানে।

টর্চের আলো ফেলে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে কৃষ্ণেশ মুখার্জী। সঙ্গে আদিবাসী বাজিয়া কুলি আর তার স্ত্রী সাঁওলী। ওদের হাতে গাছ কাটবার কুড়ুল, পাথর ভাঙবার শাবল, হাতুড়ি—আত্মরক্ষার জন্যে ফারসা টাঙি, ভালা, বর্শাও।

মাসখানেক এসেছে এ জায়গাটায় জিওলজিস্ট কৃষ্ণেশ। কৃষ্ণেশ, বাজিয়া ও সাঁওলীর সঙ্গে এই এক মাসেই একাত্ম হয়ে গেছে। ওরা খুব অনুগত কৃষ্ণেশের। কৃষ্ণেশ প্রাণ দিতে বললেও পেছপা হবে না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সমান। কালো কষ্টিপাথরে খোদাই গড়ন। নিটোল দেহ। ওদের চলায়-বলায় প্রাণঢালা আবেগের স্রোত। চোখে মুখে সারল্যের নিখুঁত তুলির ছোঁয়া—চকচকে কালো রঙে খুশির ঝিলিক। প্রতিদিন সকাল আটটায় কৃষ্ণেশের তাঁবুতে যায় বাজিয়া সাঁওলী। কৃষ্ণেশ বেরিয়ে আসে তাঁবু থেকে। রাইফেল

ঝুলিয়ে নেয় কাঁধে। এক সঙ্গে তিন জনের যাত্রা শুরু হয় ক্রোমাইট সন্ধানে।

ক্রোমাইট, এই ঘন জঙ্গলের ভেতরের আঁধার কালো রঙে ঢেকে রেখেছে সর্বাঙ্গ। বাইরে কালো হলে কি হবে! ভেতরে অসীম শক্তি জমা করে রেখেছে—লোহার ক্ষয়রোধী শক্তি, পাহাড় ছেঁদা করবার, লোহা কাটবার শক্তি—ক্রোমিয়াম ধাতুকে বুকে আঁকড়ে ধরে।

ক্রোমাইটের চাপড়াটা হাতে তুলে নিয়ে রোজই ভাবে কৃষ্ণেশ—এর ভেতর লোহা, আবাব এর ভেতর ক্রোমিয়াম। লোহা, ক্রোমিয়াম গলিয়ে এক করলে—ক্রোমিয়াম স্টিল, লোহা কাটবার প্রাণসত্তা। মানুষের লৌহ-কঠিন মনে বিবেকের ক্রোমিয়ামে মেশালে, অমিত শক্তির অধিকাবী হ'তে পারে মানুষ। সব কিছু দুর্যোগ দুর্ভাবনা কাটিয়ে উঠতে পারে।

কৃষ্ণেশের মুখে-চোখে অপরিসীম আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। হো-হো করে হেসে ওঠে। প্রাণ খোলা হাসিতে বনভূমি মুখর হয়ে ওঠে। দূরে গাছের আড়ালে খসখস আওয়াজ হয়ে মিলিয়ে যায়। বোধ হয় কোনো শ্বাপদ প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়। বাজিয়া-সাঁওলী অবাক বিস্ময়ে কৃষ্ণেশের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ভাবে—খোঁজা জিনিস সহজে পেয়ে যাচ্ছে বাবু। ম্যাপ দেখে দেখে খোঁড়া আর ঠিক সেই জায়গা থেকেই কালচে জমাট চাপড়াটাও মুখ বার করছে। তাই বাবু আহ্লাদে ফেটে পড়ছে একেবারে।

দিনের পর দিন নকশা মাফিক খুঁড়েই চলেছে কৃষ্ণেশ—ক্রোমাইট বেল্ট ধরে জায়গায় জায়গায়। বিশ্বাসী সাক্ষী দুটিও অনুসরণ করে চলেছে ওকে।

জঙ্গল থেকে ঘন জঙ্গলে ঢুকতে হচ্ছে ক্রমে। বাজিয়া-সাঁওলী ঘন গাছের ডাল কেটে যাবার পথ করে দিচ্ছে।

নির্দিষ্ট জায়গায় শাবল হাতুড়ি চালাচ্ছে। কৃষ্ণেশ খানিক পরে হাতের ইঙ্গিতে নির্দেশ করলে ওদের—থাক! আর নয়। মুখে বলছে,

স্যাম্পল তো—নমুনা, ওইটুকু হলেই হবে।

এই ভাবে রোজ কাজ চলেছে কৃষ্ণেশের। তাঁবুতে রিনি একলা বসে ভাবে—বড্ড আপনভোলা কৃষ্ণেশ—কাজ পাগল। কাজ করবার সময় কিচ্ছু খেয়াল থাকে না—টিফিনটা ফেরত না আসে শেষে! তবে একটা মস্ত ভরসা, বাজিয়া আছে। ও ছেলেটার কর্তব্য জ্ঞান আছে। কৃষ্ণেশ ভুলে গেলেও ঠিক খাওয়াবে'খন।

রিনির সঙ্গে কৃষ্ণেশের বিয়ে হয়েছে বছর দুয়েক। নিজেদের মধ্যে পরস্পরের মন জানাজানি হয়েই বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে দুজনে। কৃষ্ণেশ যেখানেই যাক না কেন—রিনিকে সঙ্গে নেওয়া চাইই। মায়ের কাছে রেখেও বিশ্বাস নেই। রিনিরও কৃষ্ণেশকে একা একা বিদেশ বিভুঁইয়ে ছাড়তে মন চায় না।

কৃষ্ণেশের মা সুহাসিনী দেবী কতবার বলেছেন ছেলেকে—বাইরে জঙ্গলে জঙ্গলে কাজ তোদের, বৌমার সঙ্গে থাকাটা কি ভালো হবে? ঈশ্বর করুন, কোনো বিপদ না হক—

কৃষ্ণেশ ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে মাকে বলেছে. ভয় কি? বন্দুক আছে। হাত দুটোয় পেশী ফুলিয়ে দেখিয়েছে—তোমার বৌয়ের বিপদের সম্ভাবনা নেই কোনো। নিশ্চিন্তে থাকতে পার!

সুহাসিনী দেবী জোড়াহাত কপালে ঠেকিয়ে ঊর্ধ্ব নয়নে চেয়েছেন খানিক! ছেলের কথায় তাঁর আত্মবিশ্বাস আছে। একগাল হেসে বলেছেন—মঙ্গল হক।

ছেলে-বৌয়ের বাইরে যাবার সময় অভয়বাণী শুনিয়েছেন, আমি আশীর্বাদ করছি—কোনো বিপদই তোমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। কাজ সেরে খুশি মনে নির্বিঘ্নে ফিরে আসবে।

মাতৃভক্ত কৃষ্ণেশ মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে মনের বল সঞ্চয় করে। বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সকল কাজেই অসাধ্য সাধন করবার প্রবল বাসনা একটা পেয়ে বসে। মনে প্রাণে জড়িয়ে থাকে। ছাড়তে চায় না।

কৃষ্ণেশের ধারণা, মা বেঁচে থাকলে, তার কোনোদিন অশুভের ছোঁয়া লাগবে না। মায়ের জন্যে দুনিয়ার কাউকে ভ্রূক্ষেপ করে না সে। নিরালায় একলা বসলেই তার মনে জেগে ওঠে ছেলেবেলার স্মৃতির টুকরোগুলো। ওর আগেকার দিন-ক্ষণ-পরিস্থিতিকে চোখের সামনে টেনে এনে হাজির করে এক এক করে।

তখন বছর দশেক বয়েস হবে কৃষ্ণেশের। এক মর্মান্তিক ঘটনার সামনে পড়তে হল ওকে। দেওঘর থেকে ফিরছে বাপ-ছেলেতে। ঝক ঝক শব্দে ট্রেন চলছে। কামরার ভেতর ঘুমন্ত ঢুলুনি। যাত্রীরা ঢুলছে, ঘুমচ্ছে। কামরাভরা অলস নিদ্রার আমেজ। ঘড়ির কাঁটা তিনটের ঘর পেরিয়ে গেছে। পৌষরাতের হিমেল বাতাস ঢুকছে কামরার উত্তরের খোলা জানলা দিয়ে। ঘুমের ঘোরে বুক অবধি কম্বলটা টেনে দিচ্ছে কেউ। র‍্যাপারটা মাথা পর্যন্ত ঢেকে নিলে কেউ। কেউ বা জোড়াহাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে ঠক ঠক করে ট্রেন চলার তালে তালে কেঁপে চলেছে।

ব্যাণ্ডেল স্টেশনের কাছ বরাবর কানে তালা লাগা একটা ভীষণ শব্দ হল। সমস্ত কামরাটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল এক মুহূর্তে অন্য ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কায়।

এখনো মনে হলে চোখ ফেটে জল ঝরে কৃষ্ণেশের। জ্ঞান আছে কৃষ্ণেশের অথচ উত্থানশক্তি রহিত। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। প্রাণপণে এক ভাবে চিৎকার করে ডেকেছে সে—বাঁচাও! বাঁচাও! একটু জল!

নিমেষের মধ্যে কি যে হয়ে গেল কিছুই অনুভব করতে পারেনি কৃষ্ণেশ। যখন সচেতন হল সে, তখন বুঝতে পারল, টুকরো টুকরো কাঠের স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে রয়েছে। মাথাটা কি ভাগ্যি বেঁচে গেছে—একটা লোহার পাত মাথার এক বেগদা উঁচুতে আড়াআড়ি ভাবে খানিক দূর পর্যন্ত সেতু তৈরি করেছে। যে সেতুর তলায় কৃষ্ণেশের অক্ষত মাথা মরণ-গহ্বরের মধ্যে পড়েও অমর হয়ে রয়েছে।

ট্রেনের ভগ্ন স্তূপ থেকে কৃষ্ণেশের বাবা শ্রীমোহনের নিষ্প্রাণ দেহকে বার করা হল। শ্রীমোহনকে একেবারেই চেনা যায় না। চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। পেটের নাড়িভুঁড়ি বাইরে ঝুলছে। মাথাটাকে নোড়া দিয়ে কে যেন পিষে দিয়েছে।

সনাক্ত করবার সময় কৃষ্ণেশ বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। দু'মাস ধরে সেও ভুগেছিল। তার সর্বশরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছল। অসুস্থ অবস্থায় বিকারের ঘোরে 'বাবা-বাবা' বলে চিৎকার করে উঠত। অবিশ্যি এসব কথা মায়ের মুখে পরে শোনা।

এও শুনেছে—বাবার ওই বীভৎস চেহারা দেখে মা-ও নাকি অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিলেন। তিনদিন অবধি জ্ঞান ফেরেনি। মাকে নিয়েও যমে-মানুষে টানাটানি হয়েছিল।

কৃষ্ণেশের মুখ চেয়েই বুক বেঁধে ছিলেন—ধৈর্য ধরেছিলেন হৃৎপিণ্ড-জ্বালান ব্যথাকে চেপে রেখেছিলেন সুহাসিনী দেবী। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে জলভরা চোখে হাসি টেনে এনেছেন একমাত্র ছেলেকে মানুষ করে তুলতে। ডাক্তারি ডাকে রোগী দেখতে যেতে হত দেশ-বিদেশে শ্রীমোহনকে। এই রোগী দেখা—কালযাত্রাই হয়েছিল দেওঘর যাওয়া।

শ্রীমোহনের মরবার মাসখানেক আগে থেকেই কি যেন অদ্ভুত বাতিক হয়েছিল একটা। কৃষ্ণেশকে কিছুতেই ছাড়তে চাইতেন না। কাছ ছাড়া করতে চাইতেন না। একটু চোখের আড়াল হলেই পাগলের মতো 'কৃষ্ণেশ কৃষ্ণেশ' ক'রে চিৎকারে বাড়ি মাতিয়ে তুলতেন। রুগী দেখতে যাবেন, তাও কৃষ্ণেশের সঙ্গে যাওয়া চাই-ই।

—ন'দশবছরের ছেলেকে কি ডাক্তার করবে নাকি?

সুহাসিনীর বিদ্রূপ মেশান কথার উত্তরে সদাশিবের মতো হাসি মুখেই বলেছেন শ্রীমোহন—এই বয়েসে কাছে থাকলে রুগী দেখার পর রোগের বিষয়, প্রতিকারের বিষয় বোঝালে মনে গেঁথে যাবে এসব চিরদিনের জন্যে—ভবিষ্যতে ভালো ডাক্তার হতে পারবে সহজেই।

ট্রেন দুর্ঘটনায় শ্রীমোহনের বুকের হাড়-পাঁজরা ভেঙে মৃত্যু হওয়ায়

সুহাসিনী দেবীরও বুকের হাড়-পাঁজরাগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে যেন। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে হল সুহাসিনী দেবীকে। তাঁর হৃৎপিণ্ডের প্রাণ, তাঁর অন্ধের যষ্টি, শিবরাত্রির সলতেকে হারাতে চান না। চোখের আড়াল করতে চান না।

ছেলের ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছে থাকলেও মায়ের অ-মতে কিছু করতে মন চাইল না। মায়ের মৃত্যুর কারণ হবে—অর্ধ উন্মাদ মায়ের পূর্ণ উন্মাদের হেতু হবে—এটা বরদাস্ত করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়াল কৃষ্ণেশের কাছে। সদাসর্বদা মা কিসে শান্তি পান, কিসে অন্যমনস্ক হয়ে থাকেন খানিক—বাবার দুর্ঘটনার বীভৎস চেহারার ছাপ মুছে যায়—এই চেষ্টাই তার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল।

দশ বছরের কৃষ্ণেশ বুঝেছিল, তার শিশুমনের আবরণে লুকিয়ে রয়েছে একটি শক্ত মন। সে মনের বয়সের গাছ-পাথর নেই। সে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। কৃষ্ণেশকে হুঁশিয়ার করে বলে, ভেঙে পড়লে চলবেনা। তোমাকে বাঁচতে হবে। মাকে বাঁচাতে হবে। জীবন-যুদ্ধে এক একটি সৈনিক ক্লান্ত হয়ে পড়ে গেছে এমনি কতশত। (পেছনের দলবাঁধা যুদ্ধোন্মাদ সৈনিকরা ভ্রূক্ষেপ করেনি—করলে, পরাজয় বরণ করতে হবে তাদের। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হবে। তাই পড়ে যাওয়া সৈনিকের ক্লান্ত দেহের ওপর দিয়ে সজোরে পদক্ষেপ করে এগিয়ে গেছে পেছনেররা। এছাড়া তাদের উপায়ই বা কি !)

কৃষ্ণেশ দুর্দান্ত হয়ে উঠতে লাগল ক্রমে। তার অতীতকে ভোলবার ইচ্ছে—সামনে এগুবার ইচ্ছেই মনকে—দেহকে সবল করে তুলতে লাগল। সুহাসিনী দেবীর স্বামী-শোক মাথায় উঠল। ছেলের জন্যে বাড়িসুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ হয়ে পড়তে লাগল। ছেলেকে শান্ত করে তোলবার, বুঝদার করে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টার অতল তলে ডুবে গেলেন সুহাসিনী দেবী।

সুহাসিনী দেবীর প্রাণঢালা স্নেহে স্নান করে কৃষ্ণেশ এক এক করে ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট, বি এস সি পাশ করল। দশ বছরের

কিশোর—উনিশের যুবক হল। বাপের মতো বলিষ্ঠদেহী, স্বর্ণকান্তি। ছ'ফুট লম্বা কৃষ্ণেশকে দেখলে সুহাসিনী দেবীর মনে হয় শ্রীমোহন মরেনি—বেঁচে আছে।

হঠাৎ জিওলজির ভূত চেপে বসল কৃষ্ণেশের মাথায়। তাকে জিওলজি পড়তে হবেই। মাটির তলায় কত রত্ন লুকিয়ে আছে—তাদের সঙ্গে তার পরিচয় করতে হবে। পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ভেতরের স্তরের ক্রমে ক্রমে পরিবর্তনের বিস্ময় তাকে জানতে হবে। পরিবর্তনে একই জিনিসের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের ভেতর তার অন্তর্দৃষ্টিকে পৌঁছে দিতে হবে।

পাহাড় মাটির হাতছানি কেবল মাথার মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল কৃষ্ণেশের।

সুহাসিনী দেবী ছেলেকে জিওলজি পড়তে দিতে আপত্তি করেন নি। আপত্তি হয়ে দাঁড়াল, যখন জিওলজিস্ট হয়ে বাইরে যাবার, পাহাড়-পর্বত-জঙ্গল ঘোরবার তাগিদ পড়ল কৃষ্ণেশের। যে বাইরে বেরনোর জন্যে কর্তার ইচ্ছেকেও মানেননি সুহাসিনী দেবী—ছেলেকে ডাক্তারি পড়তে দেন নি—সেই বাইরে যাওয়া কাজ হল কৃষ্ণেশের। ডাক্তারি তো ছিল ভালো। এ আরো ঝামেলার, আরো বিপদের—ভয়ের! বুক কেঁপে উঠেছিল সুহাসিনীর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণেশকে একাজ থেকে নিরস্ত করতে পারেন নি। ছেলের দিনরাত বোঝানো—ভয় নেই—বন্দুক আছে—রাইফেল আছে—পিস্তল আছে। গাড়ি লোক-লশকর সব আছে। তার ওপর সুনাম—অভিজ্ঞতা হবে প্রচুর। মোট কথা, বাইরে যেতে না দিলে কৃষ্ণেশ সুখী হতে পারবে না কিছুতেই। মরণ তো মানুষের ঘরে বসে বসেই হতে পারে—এই সেদিন, পাশের বাড়ির জ্ঞাতি মৃণাল কাকা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে গেলেন। কেউ জানতেও পারে নি! কেন, সেও কি বাঁচেনি মরণের মুখ থেকে? এক সঙ্গে সে, বাবা—

মুখে হাত চাপা দিয়ে সুহাসিনী দেবী ভেজা গলায় বলেন—আর বলিসনে কিছু। মত দিচ্ছি।

জিওলজিস্ট হিসেবে বেশ নাম করেছে কৃষ্ণেশ, এ চাকরিতে তাকে ঘুরতে হয় ভারতের নানান জায়গায়। যেখান থেকে যে ধাতু পাথরের নমুনা চিনে এনে দিয়েছে, নির্ঘাৎ সেখানে সেই পাথরের বিরাট জায়গা জড়ে বেল্ট পাওয়া গেছে—। অফিসে কৃষ্ণেশের নাম—পয়ামানুষ।

ছাব্বিশ বছরেব যুবক কৃষ্ণেশ অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে উড়িষ্যার এই সাকুয়াবিল গাঁয়ে, তোমকা পাহাড়ে, দ্বৈতারী মহাগিরির মাঝে—নিবিড় জঙ্গলের আনাচে-কানাচে। প্রতিদিন জঙ্গলের মাটি খুঁড়ে ক্রোমাইট পাচ্ছে কৃষ্ণেশ নির্বিঘ্নে। কোনো বাধা বিপত্তি পায়নি কোনো দিন। কিন্তু আচমকা বাজিয়ার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ায়, এগুতে নারাজ হওয়ায়—অবাক লাগে কৃষ্ণেশের। এরকম অবাধ্য তো কোনো দিনই হয়নি বাজিয়া! তবে?

কৃষ্ণেশ সামনের দিকে পা বাড়াল। তার দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। আজ যেখানটা খোঁড়বার কথা, সেখানে লালচে-খয়েরি রঙের ক্রোমাইট পাবার কথা···

পেছন থেকে কোট টেনে ধরলে বাজিয়া।—বাবু! জিবো নাহি! জঙ্গলেরে বাঘ থিবারো।

এত দিন জঙ্গলে ঘোরা হচ্ছে বাঘের চিহ্ন চোখে পড়েনি, এখন বাজিয়া বাঘ না দেখেই বাঘ আছে বুঝলে। মুচকে হাসল কৃষ্ণেশ। সাহসী কণ্ঠে বলল—ওসব পাগলামো ছাড় দিকিনি। সঙ্গে চল! ভালো ক্রোমাইট পাব।

জোড় হাত করে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল বাজিয়া—শালগাছ

তলাটা ইশারায় দেখিয়ে দিল—বাঘের নখ আঁচড়ান দাগ রয়েছে—রক্তের ফোঁটা শুকোয়নি এখনো। নখ শানিয়েছে বাঘ। এরকম চিহ্ন দেখে তাদের বাপ চোদ্দ-পুরুষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যথেষ্ট। এটা তাদের সঠিক অভিজ্ঞতা। এ চিহ্নে এটাই প্রমাণ করে, বাঘ আশেপাশে নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে, সুযোগ বুঝে কারো ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেই।

কৃষ্ণেশ অবিশ্বাসের হাসি হাসল। জোর গলায় বলল, ভয় পাবার কারণ নেই কোনো। তোরা না যাস, আমি যাবই। সঙ্গে রাইফেল আছে। বাঘ ঝাঁপালে আমরাও ঝাঁপাতে জানি।

কৃষ্ণেশের জোর গলার কথা মনে লাগল না বাজিয়ার। বাজিয়া বাবুর কথা মেনে নিতে পারল না। বিশ্বাস করতে পারল না। সে যা বলেছে, সে ব্যাপার যে তার চোখের সামনে ঘটে গেছে কতবার। বাবুর জিদে একটা অনর্থ ঘটবে শেষে। বাজিয়ার মুখে ভয়ের ছায়া ছেয়ে গেল। নিশ্চিত বিপদ আশঙ্কায় তার বুক দুরদুর করে উঠল।

—দোহাই বাবু, কথা রাখেন!

কথা রাখবে কেমন করে কৃষ্ণেশ? সে কি সেই ছেলে?

—ছ'বছর বয়সে মধুপুরে গেছল। পাথর-চাপটির ওখানে একটি বাগানবাড়ি পোড়োবাড়ি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। সে বাড়ির ধারে কাছে কেউ কস্মিনকালে যেতে সাহস করত না। বাড়িটিতে নাকি ভূতের উপদ্রব খুব। কেউ কোনোদিন টিকতে পারেনি ওখানে। এখনও শোনা যায় গোঁয়াতুর্মি করে অতি সাহসী দু'একজন 'কুছপরোয়া নেহি' ভাব দেখিয়ে রাত্তিরে ছিল বাড়িটিতে। সকালে তাদের খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। সম্পূর্ণ নিখোঁজ। বছরের পর বছর কেটে গেছে। কত বছর হয়ে গেল। কিন্তু না-পাত্তার কোঠায় তারা এখনো পড়ে রয়েছে।

স্থানীয় লোকেরা এসে কৃষ্ণেশের বাবার কাছে শোনচ্ছিল রোমাঞ্চকর কাহিনীটি। যাবার সময় ওরা এ ইঙ্গিত দিয়ে যেতেও

ভুল করল না।—সত্য ব্যাপার, উপন্যাস-রোমাঞ্চ-রহস্য কাহিনীর *চেয়েও আশ্চর্য। শুনলে অবিশ্বাস আসে। বিশ্বাস করা যায় না।* বাড়িটিতে ভয়ানক ভূতের উপদ্রব।

কৃষ্ণেশের মনের ভেতর উথাল-পাথাল করতে থাকে লোকটির কথাগুলো। রাতে থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। মাঝ রাতে উঠে পড়ল কৃষ্ণেশ। পা টিপে টিপে বারান্দায় বেরিয়ে এল। বাগানে এসে গেটে তালা দেখে ভাবছে—কি করা যায়? এমন সময় মায়ের গলার আওয়াজ কানে ভেসে আসতে মাথা ঘুরে গেল—নিরাশ হয়ে মায়ের ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য হয়ে ওপরে উঠে এল। ভূত ধরা—দেখা আর হয়ে উঠল না।

এই রকম দুঃসাহসী অনুসন্ধানী মন যার ছেলেবেলা থেকে—ভূত-প্রেত বিশ্বাস করে না যে—প্রাণের ভয় করে না যে—তার হাতে রাইফেল হাতিয়ার থাকতে কেমন করে বাজিয়ার অনুরোধ মানবে প্রাণের ভয়ে?

গম্ভীর গলায় বলল কৃষ্ণেশ—বুনোদের ভেবেছিলুম দুর্দান্ত—ভয় বলতে কিচ্ছু জানে না। কিন্তু এখন দেখছি, ভীরু কাপুরুষ। ঠিক আছে। এখানে দাঁড়া।

কোনোদিকে লক্ষ্য না রেখে, বাজিয়ার কথা গ্রাহ্য না করে, হন-হনিয়ে চলতে লাগল সামনের দিকে কৃষ্ণেশ।

হতভম্ব হয়ে গেল বাজিয়া আর সাঁওলী—বাবুকে ছাড়া যায় না কোনো রকমেই। বাবু ভুল করেছে। না বুঝেই করছে। আমাদের জেনে শুনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত হবে না। বাবুর জানের মূল্য কম নয়। আমাদের চেয়ে ঢের বেশি। বাবুকে বাঁচাতে হবে। সাঁওলী তুই দাঁড়া। আমি যাই। কথাগুলো মুখস্থের মতো বলেই, কৃষ্ণেশের পেছনে দৌড়তে লাগল বাজিয়া।

আনচান করে উঠল সাঁওলীর মন। বাজিয়াকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে সে। জিতো তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। কত পায়ে ধরে কেঁদেছিল। কিন্তু সাঁওলী রাজি হয়নি বিয়ে করতে।

বাজিয়ার সঙ্গে এই নিয়ে কতো মার-পিট দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে জিতোর। গাঁয়ের লোক বলে—জংলীদের মধ্যে এরকম পিরিত দেখা যায় নি কখনো। এক ছেড়ে এক ধরা—এ তো জংলী সমাজের নিয়ম। সাঁওলী খালি ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে। বাজিয়ার জন্যে এত সহ্য করতে হয়েছে সাঁওলীকে। সেই বাজিয়ার যদি কিছু হয়—তাও আবার তার সামনে—স্থির থাকতে পারল না সাঁওলী। ছুটল। পেছু ফিরে বাজিয়া সাঁওলীকে দেখে খুশী উপচে পড়ল কৃষ্ণেশের চোখে-মুখে।

রহস্য করে কৃষ্ণেশ বলল—কিরে বাজিয়া, বাঘ যদি ঘাড়ে এসে পড়ে এবার? তখন?

বাজিয়া মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, বাবু চারদিকে লক্ষ্য রেখে হুঁশিয়ার হয়ে চল।

খানিক এগুবার পর বাজিয়া ফিস-ফিসিয়ে বলল, বাবু—চেয়ে দেখ পুবদিকটায়?

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণেশ। সত্যিই তো! জমাট অন্ধকারের বুকে দুটো আগুনের ভাঁটা জ্বল জ্বল করছে।

বাঘটা ঘাপটি মেরে বসে আছে। শিকার ধরবার তাক খুঁজছে। চোখ দু'টোর নির্দয় আগুন ছুঁড়ে মারছে কার দিকে ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, এখুনি লাফিয়ে পড়বে তিন জনের এক জনের ওপর। দেরী করা নয় আর। রাইফেলটা নিশানা করে নিল কৃষ্ণেশ।

বাজিয়া কৃষ্ণেশের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল—বাবু, ব্যস্ত হয়ো না! ওর দিক থেকে চোখ ফেরালে, চোখের পলক পড়লে এখুনি অনর্থ ঘটে যাবে। ভালো করে বুঝেসুঝে তবে গুলি ছুঁড়বে—ফসকে গেলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। আমিও বর্শা টাঙি নিয়ে প্রস্তুত। সাঁওলী প্রস্তুত থাক তুইও। ঘাবড়াস নে!

ভয়াবহ ঘটনার প্রতীক্ষা-মুহূর্তে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেও জংলী মেয়ে সাঁওলীর আভিজাত্যে কুড়ুলের ঘা মারল বাজিয়ার

কথাগুলো। ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো ফুঁসে উঠল সাঁওলী। ঝাঁঝাল গলায় বলল—হাড়-জ্বালান কথা ক'সনে বাজিয়া। বুনো মেয়ে বাঘ মারতে জানে—ডরায় না!

রাগের জ্বলুনিতে, সাঁওলীর বাঘের দিকে তাকান চোখের জ্বলুনির মোড় ঘুরে গেল বাজিয়ার দিকে। আর সেই মুহূর্তে বন তোলপাড় করা প্রাণ কাঁপান 'হুম' গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ল শিকারী বাঘ, নরখাদক উপোসী বাঘ সাঁওলীর ওপর।

কৃষ্ণেশও ঠিক সময়ে—বাঘটি লাফানর তোড়জোড় সময়ে গুলি চালিয়ে ছিল পরপর ছু'বার। কৃষ্ণেশের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি। গুলি ঠিক লেগেছিল নরখাদককে। নরখাদক সেই অব্যর্থ মরণগুলি থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। লাফিয়ে পড়া তার সার হল! সাঁওলীকে আঘাত করবার পূর্বেই আহত বাঘ বনভূমির বুকে ছটফটিয়ে স্থির হয়ে গেল চিরদিনের জন্যে।

বাঘের নিষ্প্রাণ দেহটা বাজিয়া-সাঁওলী টানতে টানতে বনের বাইরে নিয়ে যেতে লাগল মহা উল্লাসে। ওরা দেখাবে পাড়ায় নিয়ে গিয়ে জাতবেরাদারদের। বাবু বাঁচিয়েছে বাঘের মুখ থেকে—সাক্ষাৎ যমের মুখ থেকে। আজ কত আনন্দের দিন। কাজ করবে না বাজিয়া-সাঁওলী। ছুটি চাইবে। কৃষ্ণেশেরও কম আনন্দ নয়। তার চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি বিয়াল্লিশ ইঞ্চি হয়ে উঠেছে জয়ের গৌরবে।

কৃষ্ণেশও কাজ বন্ধ রাখলে। ওদের সঙ্গে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। তাঁবুতে গিয়ে খবর দিতে হবে রিনিকে। রিনি কত খুশী হবে। তার চিবুক ধরে আদর করে বলবে—এই তো চাই-ই! ডার্লিং! তোমার সাহসের তুলনা হয় না। গলা জড়িয়ে ধরে রিনি গেয়ে উঠবে, বঁধু, তোমার গরবে গরবিনী আমি।

চলতে চলতে সাঁওলী কৃতজ্ঞতা-ভরা সজল চোখ ছুটো তুলে ধরছিল কৃষ্ণেশের মুখের ওপর। বাবু কত সুন্দর! কত ভালো। আজ বাবু না থাকলে, বাবুর রাইফেল না থাকলে কি হত? এতক্ষণে বাঘের পেটে হজম হয়ে থাকত সে। কত ক্ষমতা বাবুর—

বাবুর হাতিয়ারের। বাজিয়া তো দিশেহারা হয়ে পড়েছিল, টাঙি বর্শা ছুঁড়েছিল কিন্তু বাঘের অঙ্গ স্পর্শ করে নি তার একটি হাতিয়ারও।

বাজিয়া মাথা নীচু করে চলেছে এক ভাবে। বাবু কত ভালো-বাসে! বাবুর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিলেও এ-ঋণ শোধ করা যাবে না কখনো।

তাঁবুর কাছে বাঘটাকে রেখে সাঁওলী-বাজিয়া জাতভাইদের ডেকে নিয়ে এল। হাঁড়িয়া-মদ খেতে লাগল সকলে মিলে। ফুর্তির হুল্লোড় চলল। নাচ-গান শুরু হয়ে গেল মাদল বাজার তালে তালে। মেয়ে ছেলে পরস্পরে কোমর ধরাধরি করে ঘুরে ঘুরে, এগিয়ে পেছিয়ে নাচতে লাগল। নারী-পুরুষ এক সুরে গলায় গলা মিলিয়ে গাইতে লাগল—তু-মু দিইজাকো এক থিবারো···তুমি আমি দুজনে এক মন-প্রাণ।

তাঁবুর বাইরে দু'টি ঘোড়ায় দু'জনে পাশাপাশি বসে বসে আদি-বাসীদের নাচ-গান উচ্ছ্বাস উপভোগ করছে রিনি কৃষ্ণেশ।

স্বামীর বীরত্বে মাঝে মাঝে রিনির মুখ চোখে হাসির ঝিলিমিলি খেলে যাচ্ছে।

নাচতে নাচতে ছন্দপতন হল। বাজিয়াকে ছেড়ে দিয়ে সাঁওলী একটা বনফুলের তোড়া নিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে কৃষ্ণেশের কাছে এসে হাজির হল। হাসির ধমকে সমস্ত শরীর দুলে উঠতে লাগল, নেচে উঠতে লাগল সাঁওলীর। নাচের ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে, বনফুলের তোড়াটা কৃষ্ণেশের হাতে গুঁজে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

কৃষ্ণেশ ফুলের তোড়াটা রিনির দিকে এগিয়ে ধরল। রিনি ফুলের তোড়াটা নিয়ে বুকে চেপে ধরল। একটা বুক ভরা তৃপ্তির নিঃশ্বাস টেনে নিল। বলল, মুখার্জি! এরা কত সরল, কি কৃতজ্ঞতা জ্ঞান, কি অকৃত্রিম ভালোবাসা!

রিনির চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে কৃষ্ণেশ বলল, তুমি কি কম সরল রিনি! তোমার মতো দ্বিতীয় মেয়ে আমার জীবনে চোখে পড়েনি।

এই ঘটনার পর অনেক দিন বাজিয়া ছাড়া একা একাই কাজে চলে আসতে লাগল সাঁওলী। বাজিয়া তাতে খুব খুশী। সাঁওলীকে কোনো দিন জিজ্ঞাসা করেনি, কেন আগে যাস তুই! জিজ্ঞাসার তো দরকার পড়ে না। বাবু বাঁচিয়েছে ওকে। তার প্রাণের সাঁওলীকে। সাঁওলী তো ধরতে গেলে বাবুরই। বাবু যদি সেই সময়ে গুলি না ছুঁড়ত, সাঁওলীকে জীবনের মতো হারাতে হত। সে তো দাঁড়িয়েছিল। স্বামীর কর্তব্য কি করতে পেরেছিল? সাঁওলী খুব ভালো —বাজিয়া ছাড়া কিছু জানে না। সাঁওলীর সেদিনকার মূর্তি এখনো চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাজিয়ার।

জিতো মাঝরাতে এসে কোয়েল পাখির ডাক ডাকছে। বাজিয়া বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল সত্যি কোয়েলের ডাক। নকল বুঝতে পারা যায়নি। ধরতে পারা যায়নি। হুবহু আসলের মতো। জিতো যে হরবোলা, বনের সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের ডাক অবিকল নকল করে, এব্যাপারটা জানলেও, তখন মনে আসে নি বাজিয়ার।

সাঁওলী ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল চাটাই থেকে। বাজিয়া চোখে হাত চাপা দিয়ে ফাঁক থেকে পিটপিট করে দেখছিল বসন্তের কোয়েলের ডাকে সাঁওলীর মনে বসন্ত দোলা দিয়েছে বোধ হয়। সাঁওলী হয়ত তার মাথার বনফুলটি খুলে বাজিয়ার ঢেউ খেলান ঝাঁকড়া চুলে গুঁজে দেবে। কিন্তু বাজিয়ার কল্পনা-বিলাসকে নিমেষে ভেঙে চুরমার করে দিলে সাঁওলী। ফুলের বদলে টাঙিটা তুলে নিলে হাতে। বাজিয়ার মনে সন্দেহের দানা বেঁধেছিল।—কি জানি জিতোর কারসাজি কিনা! এখনো জিতো গোপনে আসে

হয়ত। সাঁওলী বিশ্বাসঘাতিনী। তার কাছে তার মতো, জিতোর কাছে জিতোর মতো। জিতোর সঙ্গে ষড় করে তাকে হয়তো খুন করবে। তখন মনে পড়ে গেছল—বোধ হয় কোয়েলের ডাকটা হরবোলা জিতোর। আত্মরক্ষার তাগিদে ওকে শায়েস্তা করতে সচেতন হয়ে উঠেছিল বাজিয়া। চোখ থেকে হাত নামিয়ে নিয়েছিল।

অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখছিল। টাঙি নিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সাঁওলী। কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সাঁওলীর এভাবে যাওয়াটা মোটে ঠিক হচ্ছে না। কি ব্যাপার তাও জানে না বাজিয়া। সাঁওলী কিছু জানায় নি। অথচ—সাঁওলীর বিপদ আশঙ্কায় বাজিয়া জাপটে ধরেছিল সাঁওলীকে। সাঁওলী রাগে ফুলছিল। সর্বশরীর থর থব করে কাঁপছিল চাপা উত্তেজনায়। বাজিয়া ধরাতে ফেটে পড়ল সাঁওলী, চিৎকার করে উঠলো—ছাড় বুদ্ধু! তোর দুশমনকে—হারামি জিতোকে আজ জন্মেব মতো পেছনে লাগা ঘুচিয়ে দেব—ঘাড় থেকে মাথা নামিয়ে তবে ছাড়ব। আমি তাকে বলেই রেখেছি, রাত্তিরে আসতে—পালাব বলে। তা না হলে ধূর্ত আসত না। বাইরে এসে দেখে দু'জনেই—জিতো পালাচ্ছে। জিতো তাদের কথা-বার্তা শুনতে পেয়েছিল নিশ্চয়—তা'নাহলে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে।

বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে সাঁওলীর দিকে বাজিয়া। সাঁওলীর সততায় দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত গড়ে ওঠে মনে। সন্দেহের দানাগুলো গুঁড়িয়ে যেতে থাকে এক এক করে।—সাঁওলী পালাতে পারত। পালাবারই বা কি দরকার? এমনিই তো বাজিয়াকে ছেড়ে দিয়ে জিতোকে বিয়ে করতে পারত। আটকাবার কারো সাধ্যি নেই। কিন্তু যা পারা উচিত ছিল, তা সে করেনি। করতে পারে না কখনো। সে যে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে বাজিয়াকে। বাজিয়া ছাড়া সাঁওলী দুনিয়ার কাউকে জানে না।

হ্যাঁ, সাঁওলী তাকে ডাকেনা কাছে যেতে। সারাদিনের খাটুনিতে সাঁওলী ভাবে—বাজিয়া আর একটু ঘুমুক। পাছে বাবু রাগ করে,

সেই ভয়ে সাঁওলী নিজে গিয়েই কাজ বজায় রাখে। বাবু সাঁওলীর জীবনদাতা। অন্তত সেই জন্যেও ধর্মের মুখ চেয়ে, সাঁওলীর বাবুর কাজ করা উচিত—সময়ের হিসেব না রেখে। সাঁওলী তাই করেছে। এতে বাজিয়া সন্তুষ্ট।

আজকাল সাঁওলীর রোজ একটা করে বনফুলের তোড়া বাবুকে উপহার দেওয়া চা-ই। উপহার দেবার সময় একটু মুচকে হেসে, বাঁকা চোখে ফিরে ফিরে দেখা চাই সাঁওলীর। এ কাজটা ক্রমে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। রোজ এ ভঙ্গিটা বাবুর সামনে না করলে মন ফস ফস করে। সাঁওলীর ঠসকে ঠমকে চলার ভঙ্গি মুগ্ধ নয়নে দেখে কৃষ্ণেশ—চলার কাব্যিক ছন্দ আছে। সাঁওলীর আঁটসাঁট গড়নের প্রতি অঙ্গটি এক একটি জীবন্ত কবিতা। সাঁওলীর কথা বলার ঢংটি সুরের মূর্চ্ছনা। সাঁওলী প্রকৃতির মেয়ে, প্রকৃতির কোলে নেচে-কুঁদে বেড়ায়।

এ-রূপটা ভালো লাগে কৃষ্ণেশের। মনের আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। সাঁওলীর সাদা ধবধবে ঝকঝকে দাঁতের হাসি যেন কত কথা কয়ে যায়—যাওয়া-আসায়।

রিনির নজর এড়ায় না সাঁওলীর ঠসক-ঠমক। তার যেন কেমন কেমন ঠেকে। রিনি খুঁজতে চেষ্টা করে—কোথায় বোধ হয় কারো সঙ্গে সাঁওলীর একটা মিল আছে। হলেই বা বুনো। হলেই বা পাহাড়ি—তা বলে এতটা বাড়াবাড়ি ঠিক নয়। আর বেশি দূর গড়াতে দেওয়া উচিত নয়। মুখার্জী সরল শিশু। ওকে ফাঁদে ফেলতে কতক্ষণ!

সেদিন ভোরে রিনি উঠেই, তাঁবুর বাইরে মোড়ায় এসে বসল। আনমনা ভাব। পাশে বসল কৃষ্ণেশ।

আদর করে পিঠ চাপড়ে বলল—রিনু, বাড়ির জন্যে মন অস্থির কি? এত উদাসী কেন?

কথাটা বিদ্রূপের ছলে হাসতে হাসতে বলেছিল কৃষ্ণেশ। কিন্তু উল্টো ফল ফলল। রিনি ব্যথা অনুভব করল ওর হৃৎপিণ্ডে। হাতুড়ির ঘা মেরে থেঁতো করে দিল যেন কৃষ্ণেশ। রিনি গর্জে উঠল। উত্তপ্ত কণ্ঠ, আমাকে পাঠিয়ে দিতে চাও একটা ছুতোনাতায়—এই তো! আমি সব বুঝেছি। আমি থাকায় অসুবিধে হচ্ছে! সরে গেলে জংলী মেয়েটার সঙ্গে পাকা-পাকিটা ভালো ভাবেই হবার সুবিধে হবে।

রিনির কথাগুলো কৃষ্ণেশের কানে সিসে গলা ঢেলে দিল। তার হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে গেল। মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল, আঃ!

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল কৃষ্ণেশ—স্বপ্নের বাইরে আমার—তুমি এভাবে বলতে পারবে কোনো দিন! ছিঃ! ছিঃ! তোমার এত নোংরামি ভরা মন। এটুকু জানবে, আমি ওকে প্রকৃতির বুকে পবিত্র শিশুর প্রতিমূর্তি রূপে দেখি। ওর ওপর খারাপ মনোভাবটা আনাও পাপ।

রিনি লজ্জায় দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে। সত্যিই উত্তেজনার বশে ভুল ধারণার দরুন কৃষ্ণেশের নিষ্পাপ মনে কি নির্মম আঘাত দিয়ে বসলে সে! কি ছোট মন হয়ে গেছে তার! কৃতজ্ঞতার তাগিদে প্রাণদাতার কাছে সাঁওলী না হয় একটু ঘনিষ্ঠ হতে চায়—এতে দোষের কি? সভ্য-বুনোর আচার-ব্যবহারের তফাৎ তো হবেই। সভ্যের নিরিখে অসভ্যের প্রকৃতি বিচার করলে ভুল করা হবে।

সংকোচ ভরা কথায় বলল রিনি—আমায় ক্ষমা কর! মুখ দিয়ে কি বলতে কি বেরিয়ে গেছে। ওদের চালচলনগুলো ঠিক আমাদের মতো নয় বলে আমাদের অপছন্দ ঠেকে।

মোলায়েম স্বরে কৃষ্ণেশ বললে—রিনু! আমি তোমার ওপর কঠোর অবিচার করে ফেললুম। যেটা করা মোটেই উচিত ছিল না। সামান্য ব্যাপারটাকে বিরাট করে তুললুম।

হাসতে হাসতে বন্যহরিণীর মতো ছুটে এল আবার সাঁওলী। একেবারে কৃষ্ণেশের গা ঘেঁষে দাঁড়াল, রিনি মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল। সাঁওলীর হাত ধরে স্নেহ-ওপচান স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল—সাঁওলী আয়! নিজে হাতে নারকেল নাড়ু করেছি—খেয়ে যা। আজ আর এমনি ছাড়ছিনা তোকে!

আগে কাজ শেষে ডেরায় ফিরে যেত বাজিয়ার সাঁওলী। এখন কিন্তু সে নিয়ম পাল্টে গেছে। বাজিয়াকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে কৃষ্ণেশের তাঁবুতে ঢোকায় সাঁওলী। রোজ এই পর্ব চলে।

বাজিয়া সাঁওলীর এ ব্যাপারটায় বিরক্ত হয় না। কৃষ্ণেশ রিনির সামনে তার শরমও আসে না, বরং ভালো লাগে। এইটাই যেন সে চায়। তার মন কৃষ্ণেশের সেবা করতে চায়। রিনির আদেশ পালন করতে চায়। কীসে কৃষ্ণেশ সন্তুষ্ট হয়, সেইটাই তার জপমালা হয়েছে আজকাল।

সেদিন তাঁবুতে ফিরে ক্লান্ত শরীরকে চারপাইয়ে এলিয়ে দিল কৃষ্ণেশ। কাছে এসে পায়ে হাত দিয়ে বলল বাজিয়া, বাবু, কষ্ট হচ্ছে খুব? বড্ড খাটো! একটু বিশ্রাম কর না! খালি কাজ, আর কাজ! শরীরটা ভেঙে যাবে যে!

পা টিপতে শুরু করে দেয় বাজিয়া। তার মন পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে। কৃষ্ণেশ আপত্তি করে।—না, একটুও কি চুপ করে বসে থাকার

অভ্যেস নেই তোদের ! সারাদিন তোরাই তো খাটিস। আমি আর করি কি ? গাছতলায়, টিলায় দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিই, নয়—বসে বসে প্ল্যান দেখি। তোরাই আমার দুটো হাত। তুই আর সাঁওলী—ডান আর বাঁ।

পেশীবহুল হাত দুটো এগিয়ে দিলে বাজিয়ার দিকে। সাঁওলী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছিল। ছুটে এসে কৃষ্ণেশের হাত দুটো টিপতে শুরু করে দিল। হাত ছাড়িয়ে নিল কৃষ্ণেশ।

তুই চুপ করে বসনা ! তোর মায়ের সঙ্গে গল্প কর। আমাদের কাজ-কর্মের কথা শোনা—কি ভাবে কাজ করি আমরা। বেচারা সারাটা দিন একলা বসে থাকে ! ওরই কষ্ট বেশি। আমি তো কাজে ভুলে থাকি। কোথা দিয়ে সময় কাটে বুঝতে পারিনে। কিন্তু—

রিনির দিকে মুখ ফেরাল কৃষ্ণেশ।

—এখন ভোগো ! আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দিন গোন !

যার যেমন ভাগ্য—সে ফল ভোগ তো তাকেই করতে হবে। বিধাতার সাধ্যি নেই দেখছি খণ্ডাবারও। যে স্বামীরত্ন পেয়েছ।

রিনি কাছে এসে মুখে হাত চাপা দিল কৃষ্ণেশের।

তুমি আমার জন্যে অত ভাব কেন মুখার্জি ! তোমাকে রোজ যে দেখতে পাই, এটাই আমার স্বর্গ সুখ। তোমাকে পেয়েও। ভাগ্য কি আমার খারাপ মুখার্জি ?

রিনির চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে। অপ্রস্তুতে পড়ে যায় কৃষ্ণেশ। রিনির চোখের জলে কৃষ্ণেশের বুকটার ভেতর মোচড় নিয়ে ওঠে। সে জানে, রিনির স্পর্শকাতর মন। তবু তার এই ঠাট্টা করা একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারছে না। রিনি বুদ্ধিমতী। সব বোঝে। কিন্তু একটা বিষয়ে একেবারে অবুঝ, অন্ধ। বিশেষ করে তার বিষয় নিয়ে ভাগ্যের কথা ও মোটে বরদাস্ত করতে পারে না। পাগল হয়ে ওঠে। কলকাতায় এ নিয়ে কত কাণ্ডই না হয়ে গেছে ! একবার এই ভাবের কথা বলে ফেলে কি

ফ্যাসাদে না পড়েছিল সে! বাপরে বাপ! মনে পড়লে এখনো বুকটার ভেতর কি রকম করে ওঠে। সে কি কান্না রিনির! অনশন ব্রত পর্যন্ত গ্রহণ করল—অবিশ্যি কথাটা তার দিক থেকে মোটেই ভালো ছিল না। যুক্তিসঙ্গত ছিল না—।—আমি বেঁচে থাকতে তোমার যত দুর্ভোগ! হেতা চলো, হোতা চলো—এখুনি তল্পি-তল্পা গুটিয়ে। ম'লে সৌভাগ্য ফিরবে! কথাগুলো স্রেফ তামাশা। তবুও—

কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রিনি শিউরে উঠল। তারপর চলল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এক নাগাড়ে কান্না। আহার নিদ্রা ত্যাগ—পুরো একটা দিন রাত। কত সাধ্যি-সাধনা! বোঝান—শেষে মা এসে যখন বলল, বৌমা! আমি আশীর্বাদ করছি তোমায়, তোমার কোনো ভয় নেই। সিঁথের সিঁদুর নিয়ে তুমিই আগে যাবে। ওঠো, খাও।

মায়ের কথায় অনশন ভঙ্গ হতে, বিপদমুক্ত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল সে। পরে রিনি এসে বলেছিল—ওগো, তুমি তো আমার সব জান! তবে এ খোঁচা দিলে কেন? কৃষ্ণেশের চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। মা এসে দু'জনকেই বুঝিয়েছিলেন। রিনিকে আবার বলেছিলেন, বৌমা! ও খ্যাপা ছেলে। বাইরে দুর্মুখ-দুরন্ত হলেও ভেতরে বড্ড নরম—বড্ড সরল! খ্যাপা বলে লোক খ্যাপান ওর স্বভাব। লোকে কাঁদলে নিজে যদি কেঁদে মরিস—তবে লোককে কাঁদান কেন? কর্তার ঐ স্বভাবটাও পুরো মাত্রায় পেয়েছে একেবারে।

—কৃষ্ণেশ তখন বছর পাঁচেকের। বেনারসে গেছি। কর্তা, আমি আর এই দুষ্টু ছেলে। সেটা মাঘ মাস। বিকেলের দিকে ছেলের হাত ধরে কর্তার সঙ্গে বেড়াতে বেরুতুম। কখনো মণিকার্ণিকার ঘাট, কখনো দশাশ্বমেধ ঘাট, এই করে এঘাট ওঘাট ঘুরে বেড়াতুম গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে পাথরের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে।

কর্তার খেয়াল হ'ল একদিক বেণীমাধবের ধ্বজায় ওঠবার। যেই

ভাবা, সেই কাজ। পুরনো দিনের বেণীমাধবের মন্দির ভেঙে সেই পাথরেই গড়ে গেছলেন এই নমাজ পড়া মসজিদ আওরঙ্গজেব বাদশাহ। বোঝাতে বোঝাতে এক এক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন কর্তা। ওপরের দিকে আকাশ ছোঁয়া মিনারের নীচে যেখান থেকে সমস্ত বেনারসকে সবুজ সাদায় বোনা একখানি বিশাল কার্পেটের মতো দেখায়—সেখানে এসে থামলেন।

আমরা তাঁর পাশে দাঁড়ালুম।

কর্তা ওপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন—মানুষের মন যখন উঁচু স্তরে ওঠে, তখন তার কাছে সব সমান। ছোট বড় পার্থক্য থাকে না। যেমন আমরা উঁচুতে দাঁড়িয়ে সমস্ত বাড়িঘর এক সমান দেখছি। ছোট-বড়র পর্দা ছিঁড়ে গেছে।

কথা কইতে কইতে হঠাৎ তিনি বসে পড়লেন। বললেন, মাথাটা ঘুরছে। নামতে পারব না আর।

আমার মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়ল—কি সর্বনাশ! এখন উপায়? বুকের ভেতর ধড়-ফড় করতে লাগল। ওপাশের মিনারের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছি—যদি ওখানকার লোকেরা এসে কোনো সহায়তা করে। সহায়তা তো দূরের কথা—কতগুলো যুবক-যুবতী ওখান থেকে আমাদের দিকে চেয়ে দেখে হেসে কুটি কুটি। আমার মনের অবস্থা এমন যে, ওদের হাসি-মশকরা আমার কানে আগুন ছুঁড়ে মারছিল। মনে হচ্ছিল—কি বেহায়া-নির্লজ্জ, এরা। মন বলে কোনো জিনিস নেই এদের—হৃদয় বলেও কিছু নেই। একটা যোয়ান মানুষ বসে পড়ল মাথা ঘুরে—তোরা দেখছিস, আমি মাথাটায় হাত বুলোচ্ছি—একটা জিজ্ঞেস তো করে, কি হয়েছে—? তা নয়। উল্টো বলতে বলতে নীচে নেমে গেল সব—লোকটা নার্ভাস হয়ে গেছে।

বাপের এই অবস্থা দেখে ছেলের মুখ শুকিয়ে চুন। বলছে—মা, ডাক্তার আনি।

কর্তা ইশারায় হাত দেখিয়ে বারণ করলেন।— যেওনা!

চোখ চাইলেন কর্তা। আমি কাঁদছি দেখে হো-হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, একটু রগড় করেছি—অমন ঘাবড়ে গেলে! চল, আর দেরি নয়। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। থাকবার নিয়ম নয়।

মা কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল কৃষ্ণেশ। রিনির মন ঘোরাবার জন্যে ওর কাঁধের ওপর হাত দুটো রেখে বলল—রিনু, বড্ড কন কন করছে। আজ শাবল চালাতে হয়েছে আমাকেও। একটু হাত বুলিয়ে দাও।

রিনির জলভরা চোখে হাসি ফুটে উঠল। সাঁওলীর কপাল কুঁচকে দুটো ছোট রেখা ভেসে উঠল। অভিমানক্ষুব্ধ গলায় বলল সাঁওলী—বাজিয়া! চল্, সন্ধে হয়ে আসছে। সাঁওলীর চোখ করকর করে উঠল—একটা জ্বালার সঙ্গে লালচে হয়ে আসতে লাগল ক্রমে। চুপ করে দাঁড়াতে পারল না সাঁওলী। তাড়াতাড়ি তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়বার উপক্রম করছে দেখে, রিনি উঠে পড়ল। সাঁওলীকে পেছন থেকে জাপটে ধরে চারপাইয়ের ওপর এনে বসিয়ে দিল। রিনি বুঝতে পেরেছে সাঁওলীর মুখ-চোখ দেখে কোথায় তার ঘা লেগেছে। সাঁওলীকে টিপতে দেয়নি কৃষ্ণেশ—অথচ আন্তরিক ভাবে আগ্রহ নিয়ে, মুখার্জিকে একটু সেবা করতে চেয়েছিল ও। সাঁওলী চলে গেলে, একটু পরেই না হয় তাকে হাত টিপতে বলতে পারত! মুখার্জি যেন কেমন ধরনের! লোককে খোঁচা দেওয়াটাই ওর সুখ। সরল মেয়ের প্রাণে দাগ পড়ুক, এটা চায়না রিনি। রিনির স্বামী কৃষ্ণেশ মুখার্জি লোককে আঘাত দেয়, এটা দেখতে পারবে না—শুনতে পারবে না—সহ্য করতে পারবে না কখনও সে।

কৃষ্ণেশের হাত দুটো নিয়ে সাঁওলীর হাতে দিয়ে রিনি বললে—
—মুখার্জি! সাঁওলী একটু—

কৃষ্ণেশ বলল, আজ থাক।

ঘুম আসছে। সাঁওলীর পিঠে সপাং করে চাবুক পড়ল যেন। বাজিয়ার হাত দু'টো ধরে, টানতে টানতে বের করে নিয়ে গেল।

সাঁওলী ফিরে এল তার ঝোপড়িতে। বাজিয়াকে বলল—হাণ্ডিয়া দে। মদ খেতে লাগল নারকেলমালা ভরে ভরে। মাতাল হয়ে নাচতে লাগল বাজিয়াকে নিয়ে। নেশা-জড়ান গলায় বলতে লাগল সাঁওলী—বাজিয়ারে, তুই আমায় ছাড়িসনে।

বাজিয়ার প্রাণেও যে ঘা লাগেনি—তা নয়। বাবু সাঁওলীর সেবা নিলে না—এতে কি কম দুঃখ বাজিয়ারও মনে। তবে সবেতে অস্থির হলে তো চলে না! বাবুর মর্জির ওপরে নির্ভর করে সব।

বাজিয়া সাঁওলীকে বোঝাতে লাগল—সাঁওলী মন খারাপ করিস না! বাবু কত ভালোবাসে দেখলি, আমাকে তার সেবা করতে দিল না—বলল, আমি এমন কি পরিশ্রম করি, তোরাই তো জান প্রাণ দিয়ে কাজ করিস। বাবুর বড় দয়ার শরীর!

মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল সাঁওলী।—থাম দিখিনি মুখপোড়া মিনসে! তোর হাড়-জ্বালান কথা আমার আর ভালো লাগে না! মাকে টিপতে বলে, কত বড় আগুন আমার বুকে জ্বালিয়েছে বাবু, তুই কেমন করে জানবি?

মুখ সামলে কথা বলিস সাঁওলী! বাবু তোকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়েছে না!

—বেশি যদি বাড়াবাড়ি করিস, আমাকে শাসন করতে চাস, তাহলে জানবি বাজিয়া, তোর বরাত ভেঙেছে। তোর খাঁচা ছেড়ে সাঁওলী পালাবে। জিতো মরেনি এখনো। কাল অবধি পেছনে ঘুর ঘুর করেছে।

বাজিয়া সাঁওলীর চুলের মুঠি ধরে টানতে লাগল—ফের! খুন করে ফেলব বলছি। তোর জিতোকে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠাচ্ছি, দেখ না!

—ওরে ছাড়! ছাড়! হতচ্ছাড়া! বাজিয়ার বুকে মুখ রেখে গদ গদ কণ্ঠে বললে সাঁওলী, বাজিয়া, বাজিয়া আমার। তোকে কি ছাড়তে পারিরে ছ্যাঁচড়া বাঁদর!

দু'জনেই হি-হি-হা-হা করে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল।

পরের দিন ভোর।

সাঁওলী বাজিয়াকে তুলে দিল। বাজিয়ার টান টান চোখে জল ছিটিয়ে বলল, তুই বাবুর কাজে যা! আজ যেতে পারব না—শরীর ভালো নয়।

বাজিয়া সাঁওলীর কথামতো কাজে এল। বাজিয়াকে একলা দেখে অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করলে কৃষ্ণেশ—সাঁওলী এল না কেন রে?

—শরীর খারাপ!

—ধুত্! সে না এলে কাজ জমবে কেমন করে? উঠে পড় ট্রাকে! চ' তোর ঘরের দিকে!

ট্রাক এসে থামল সাঁওলীর বাঁশের দেয়াল পাতার ছাউনির ডেরার সামনে। ট্রাকের গর্জনে—হর্নের আওয়াজে সাঁওলী ঝাঁপ ঠেলে বাইরে এসে দাঁড়াল। একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। ফিকা-তামাকু জ্বলছে একটু একটু করে আর পাতাপোড়ার সঙ্গে একটা উৎকট নাক-জ্বালান গন্ধে বাতাস ভরে উঠছে।

কৃষ্ণেশ বিরক্ত হয়ে বললে, সাঁওলী, তোকে না বারে বারে মানা করেছি ওই নেশাটা ছাড়! এই তোর ছাড়া! আমার মাথা ধরে গন্ধে।

সাঁওলী চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে চাপা হাসির আড়ালে বললে —ওই জন্যেই তো কাজে যাই নি বাবু। সহ্য করতে পারবে না বলে!

বাজিয়া উত্তেজিত হয়ে উঠল, মাগীর স্পর্ধা তো কম নয়! বাবুর সামনে—ন্যাকামি রাখ বলছি।

সাঁওলীর হাত থেকে ফিকা তামাক কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে বাজিয়া। পাঁজাকোলা করে ট্রাকের ভেতর সাঁওলীকে তুলে দিল।

সাঁওলী গুন গুন করে গাইতে লাগল ট্রাক চলার ঘরঘরানি আওয়াজের সঙ্গে—মু দিইজিকো এক থিবারো···। মাথা থেকে বনফুল খুলে নিয়ে কৃষ্ণেশের শার্টের পকেটে গুঁজে দিল।

—বাবু আজ সকালে যেতে পারিনি।

কৃষ্ণেশ হেসে বলল—যাসনি বলেই তো এলুম রে! তোর ফুল নেবার জন্যে।

সাঁওলী আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল। বাবু কত ভালোবাসে তাকে। মিথ্যে সে বাবুর ওপর মান অভিমান করে। আহা! বাবু যদি বাজিয়া হত—



ক্রোমাইট ফিল্ডে কাজ করতে করতে সাঁওলী ভাবে, বাবুর বৌ কত সুন্দর! ফর্সা, টানাটানা চোখ। বাঁশির মতো নাক—পাতলা সরু ঠোঁট কেমন! আর তার কালো মিশমিশে রঙ! ড্যাবরা ড্যাবরা চোখ, খাঁদা নাক, পুরু ঠোঁট! কোথায় রিনিমা আর কোথায় সে! বাবুর না-পছন্দ হবারই কথা! একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল সাঁওলী।

টং টং টং। উহু-উহু করুণ আর্তনাদ। দৌড়ে কাছে এসে দেখে কৃষ্ণেশ, বাজিয়া পাথর মাটি কেটে, ক্রোমাইটের চাপড়া বার করতে

গিয়ে, অন্যমনস্ক ভাবে পায়ের পাতার ওপরই শাবলটা বসিয়ে দিয়েছে সাঁওলীর। রক্তে রক্তে গঙ্গা। বাঁ পায়ের পাতার ওপর গভীর ক্ষত হয়ে গেছে।

কৃষ্ণেশ সাঁওলীকে পাঁজাকোলা করে ট্রাকে তুলল।

তাঁবুতে এনে, সাঁওলীর পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে, ফের ছোটাল ট্রাক কেওনঝর শহরে। হাসপাতালে ভর্তি করা হল সাঁওলীকে।

প্রচুর রক্তপাত হওয়ায় সাঁওলী নিস্তেজ হয়ে গেছে। কিন্তু অচেতন হয় নি। সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। প্রাণে অফুরন্ত আনন্দ আছে। নিজের খুনে বাবুর জামা হাত রাঙিয়ে দিতে পেরেছে সে।

—ভয় নেই সাঁওলী! শীগগির ভালো হয়ে উঠবি তুই! টাকার জন্যে ভাবিসনা! রোজ দেখে যাব।

সাঁওলীর চোখ ত্নটো ধিকধিক করে উঠল। বাজিয়া মাথা নীচু করে বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে এল। সাঁওলী ম'লে তার আর ত্নঃখু কষ্টের বালাই থাকবে না। বাবু দেবতা। যা করছে—এতেও যদি কিছু হয়, নিয়তি জানতে হবে তাহলে।

হাসপাতালে রিনিও কৃষ্ণেশের সঙ্গে রোজ আসতে লাগল। সে একটা করে ফুলের তোড়া উপহার দিত সাঁওলীকে। সাঁওলীর চোখ ত্নটো হেসেই মেঘে ঢাকা হয়ে যেত। রিনির হাতের ফুলের তোড়াটা কাঁপা হাতে নিত। বুকের ওপর রাখতে গিয়ে নিজের অগোচরেই বুক থেকে ঠেলে, মেঝেয় ফেলে দিত। কৃষ্ণেশ কুড়িয়ে ওর হাতে দিত। সাঁওলী বুকে চেপে ধরে চোখ বুজে থাকত খানিক।

রিনির মনে দোলা লাগত। ফুল দিতে কি রোজই তার হাত কাঁপে, না সাঁওলীর! কেন এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটে? সাঁওলী অসুস্থ, তার হাতের ঠিক নেই, সেই সঙ্গে তার কমজোরি মনও কিছু দায়ী। তার স্পর্শে সাঁওলীর যেন কোনো অমঙ্গল না হয়। ওর শুভ কামনাই একান্ত মনে করেছে সে!

মুখার্জি বলেছে—প্রকৃতির বুকে পবিত্র শিশু সাঁওলী। তবে তার নিজের অশুদ্ধ মনই কি সাঁওলীর এই নব ত্নর্ভোগের কারণ?

এর পরদিন।

রিনি কৃষ্ণেশকে বলল—আমার জন্যেই সাঁওলী ভুগছে বোধ হয়। আমি না গেলে ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে।

কৃষ্ণেশ হতবাক হয়ে গেল।—শাবলের ঘায়ে সাঁওলীর এই অবস্থা—এতে রিনির দোষ কিসে? তাজ্জব ব্যাপার! এক ভাবে নির্জন নির্বান্ধব পুরীতে একলা থেকে থেকে অসুস্থ মন হয়ে উঠছে ক্রমে। কোনো বাদ-প্রতিবাদ করল না কৃষ্ণেশ। কৃষ্ণেশ বেরুবার সময়, অশোক ফুলের তোড়াটা হাতে তুলে দিল রিনি।

হাসপাতালে আসবার পর থেকে এই সর্বপ্রথম কৃষ্ণেশকে একলা পেল সাঁওলী। সাঁওলী উৎফুল্ল হয়ে উঠল। দু'হাত বাড়িয়ে ফুলের তোড়াটা নিয়ে বুকে চেপে ধরল। উজ্জ্বল হাসিতে তার মুখ চোখ ভরে উঠল।

—সাঁওলী! আজ কেমন বোধ করছিস?

—ডাক্তারবাবু উঠতে বলেছে এবার আস্তে আস্তে—

—তোর রিনিমা, আসতে পারে নি। তোড়াটা তোকে আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

সাঁওলীব হাতটা কেঁপে উঠল। খসে পড়ে গেল তোড়াটা হাত থেকে। সাঁওলী অস্থির হয়ে পড়ল। তার যেন যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে বেড়ে উঠল।—বাবু নিজে মন করে আনে না তাহলে—রিনিমা! রিনিমার কথা ছাড়া কি বাবুর করবার কিছু উপায় নেই? আজ যদি রিনিমার জায়গায় সে থাকত!

তোড়াটা কুড়িয়ে দিল না কৃষ্ণেশ। তার মনেও আজ কি রকম খটকা লাগল। আসবার সময় রিনি বলেছিল—সে না এলে··· এখানেও তোড়া পড়ে যাওয়া রিনির নামে, কোথায় যেন রিনির কথার সঙ্গে সাঁওলীর হাত থেকে ফুলের তোড়া পড়ার একটা মিল আছে—সূক্ষ্ম গভীর সংযোগ রয়েছে। রোজ ফুলের তোড়া পড়াটায় সে অত ভাবেনি—এমনি মনে করেছিল। তার মন অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। সাঁওলী কি রিনিকে দেখতে পারে না? কি কারণ থাকতে

পারে? রিনি সাঁওলীকে···? তাই বা কেমন করে হতে পারে? অথচ—

কৃষ্ণেশ সাঁওলীকে বলল—ডাক্তারবাবু বললেন, তোর পরশু ছুটি হয়ে যাবে। ট্রাক পাঠিয়ে দেব—বাজিয়া এসে নিয়ে যাবেখ'ন। আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। কিছু মনে করিসনা!

সাঁওলীর বুকটা হতাশায় ভরে গেল। মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল। হ্যাঁ-না কোনো উত্তর দিলে না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল কৃষ্ণেশের চলা পায়ের পেছন দিকে।

সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ফিরে এল সাঁওলী হাসপাতাল থেকে। কাজে যাবার জন্যে পেড়াপীড়ি করতে লাগল। বাজিয়া যেতে দিতে নারাজ। বাবুর বারণ। এই সবে চামড়া গজিয়েছে। একেবারে নতুন। বেশি চলাফেরা করলে দৌড়ঝাঁপ করলে কাঁচা চামড়া ফেটে যেতেও পারে! আবার ভোগান্তি বাড়বে। যাক না আর দিন কতক। কাজের তো হরজা হচ্ছে না। সাঁওলী মেয়েছেলে হলে কী হবে! পুরুষকেও হার মানায়। ওর জায়গায় যে ছেলেটা আছে, সে একটু গবেট গোছের এই যা। সাঁওলী যেমন চালাক চতুর, তেমনি উপস্থিত বুদ্ধি। তা বলে তো তার ওপর অবিচার করতে পারা যায় না। বাবুর কড়া হুকুম। সাঁওলী যদি বেশি জেদাজিদি করে, তাহলে খবর দিতে।

সাঁওলী বাবুর হুকুমনামা—নির্দেশ শোনে একবার করে বাজিয়ার মুখে। যেন কোনো দেববাণী পাঠ করে শোনায় বাজিয়া রোজ ভোরে। সাঁওলী মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনে। বোঝে।

করুণ দৃষ্টি মেলে ধরে বাজিয়ার চোখে।

—বাবু কি আমার কথা জিজ্ঞেস করে নারে আর? ট্রাকটাও তো এদিক দিয়ে আর যায় না! তোর ফেরবার সময় কান পেতে শুনতে চেষ্টা করি ট্রাকের ঘর্ঘর শব্দ। ডান হাতের কনুইয়ের ওপর দিকটা বাঁ হাতে চেপে ধরে সাঁওলী। সাঁওলীর মুখে গুমরে মরা বেদনার ছায়া জেগে ওঠে। অস্থির হয়ে পড়ে। তার যন্ত্রণা-কাতর মুখ থেকে একটা চাপা শব্দ বেরিয়ে আসে—উঃ!

বাজিয়া হতবুদ্ধি হয়ে যায়, মহাফাঁপরে পড়ে। সাঁওলীর কিসের যন্ত্রণা শুরু হল?

চাপা হাত আস্তে আস্তে সরিয়ে মৃদুস্বরে বলে—সাঁও! তোর হাতে কি কিছু হয়েছে? যন্ত্রণা হচ্ছে?

সাঁওলী বিরক্ত হয়ে ওঠে।—বাজিয়া দেরী হয়ে যাচ্ছে। তুই যা। আমার কিছু হয়নি রে।

বাজিয়ার মনের পরদায় সংশয়ের আচড় পড়ে। সাঁওলী ভাল আছে। তবু এ ঢং কেন? এ ন্যাকামি কেন? কদিন একলাই থাকে খুপরিতে। নিসঙ্গ বাজিয়া কাজে থাকে সারাদিন। এই অবসরে—এই সুযোগে সেই শয়তান জিতো-হারামি—

বাজিয়া চঞ্চল হয়ে ওঠে। হাত দুটো নিশপিশ করতে থাকে। মাথায় খুন চেপে যায়। নিজের অজ্ঞাতসারে সাঁওলীর গলা টিপে ধরে। সাঁওলীর অসহায় চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে ছেড়ে দেয়।—না, তোকে নয়—সেই বে-আদবটাকে—নচ্ছারটাকে—

বাজিয়ার আচমকা এই ব্যবহারে সাঁওলী স্তম্ভিত হয়ে থাকে খানিক। তার মনের কোণে হিংস্র বাঘিনীর চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলে ওঠে। সে জ্বালার তাপ বাইরে ছিটকে বেরুতে থাকে সাঁওলীর বিস্ফারিত চোখের তারায়।

সাঁওলীর চোখ ভরে প্রতিশোধস্পৃহার নাচুনি চলতে থাকে। আড়চোখে তাকাল সাঁওলী বাঁশের দেয়ালে ঝোলান কুকরিটার দিকে। ভাগ্যিস বাবুর নেপালী রাঁধুনিটা তাকে দিয়েছিল এটা।

এটাই আজ প্রধান মিত্র সাঁওলীর কাছে। প্রধান সম্বল চোখ ঝলসান চকচকে কুকরিটা।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল এক নিমেষে সাঁওলী।

সাঁওলী হঠাৎ একরকম হয়ে উঠল কেন ভাববার আগেই, ঝোলান কুকরিটা হাতে নিয়ে রুখে দাঁড়াল সাঁওলী—গর্জে উঠল শিকারীর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বাঘিনী—আয়, গলাটিপে খুন করবি—আয়! মরদ হোস তো এগিয়ে আয়! তোকে খুন করে জিতোকে শাদি করব। দেখি তুই কেমন করে রুখিস। পাজি কোথাকার।

সাঁওলীর বুক ঢেউয়ের মতো ওঠানামা করতে থাকে—সমুদ্রের উথাল-পাতাল ঢেউয়ের মতো—ঘন ঘন শুধু নিঃশ্বাস পড়ার তাড়নায় —চাপা গজরানি ফোঁসফোঁসানির দুরন্ত ধাক্কায়।

সাঁওলী দিক-বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তার চোখের সামনে বাজিয়া হৃৎপিণ্ডের ধক-ধকানির নাচুনি ভেসে উঠেছে। এক পা এক পা করে বাজিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। বাজিয়ার চোখে চোখ আটকে রেখেছে—বাজিয়ার চোখের পলক পড়েছে কি, নিস্তার নেই আর। বাঘিনী ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকের ওপর। সমূলে বসিয়ে দেবে কুকরি, হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করে।

পৈশাচিক উল্লাসে খিল খিল করে উঠল সাঁওলী। দুর্দান্ত বাজিয়া, ভালোমানুষ বাজিয়া স্তব্ধ নিস্পন্দ পাথর মূর্তি হয়ে গেছে। সাঁওলীর চোখের আগুনে সে সম্মোহিত। আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই নেই তার। সে যেন নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছে। কি হচ্ছে কেন হচ্ছে—কি হতে পারে—এসব সাড়া তার মনের অনুভূতির দরজায় একেবারে অনুপস্থিত।

ট্রাকের ঘর্ঘর আওয়াজ সাঁওলীর কানে পৌঁছল না। তার কান দুটো বধির হয়ে গেছে একেবারে। যে ট্রাকের আওয়াজ শোনবার জন্যে সকাল সন্ধে উৎসুক হয়ে বসে থাকত, সে আওয়াজ তার ঝাঁপের সামনে এসে আরো বিকট আওয়াজ করে থেমে গেল।

তবুও সাঁওলীর খেয়াল হল না। এত উন্মত্ততায় মেতে আছে সে!' সাঁওলীর একার যে কান বধির হয়ে গেছে তা নয়—বাজিয়ারও। বাজিয়ার নড়ন-চড়ন শক্তি রহিত হতে পারে কিন্তু বাকশক্তিও কি রহিত? শুনতে পেলে নিশ্চয় বাবুকে ডাকত। প্রাণপণ চিৎকার করে উঠত। সাঁওলীকেও হুঁশিয়ার করতে চেষ্টা করত—বাবুর জন্যে না হলেও, অন্তত নিজের আত্মরক্ষার জন্যে—ভয় দেখাবার জন্যে—ওকে নিরস্ত করবার জন্যে। না—তা হওয়ার নয়—বাজিয়ার কান-মুখও নিস্ক্রিয় হয়ে গেছে।

বাজিয়ার কাজে যেতে দেরি দেখে, ট্রাক নিয়ে একলাই বেরিয়ে পড়েছে কৃষ্ণেশ। ওকে তুলে নেবার জন্যে। এরকম অনেক দিন হয়েছে এর আগে মাঝে মাঝে। রাত্তিরে হাণ্ডিয়া খেয়ে টই-টম্বুর মাতাল হয়ে গেছে দু'জনে—বাজিয়া-সাঁওলী। সকালেও নেশার ঘোর কাটেনি। কৃষ্ণেশ এসেছে। ঘাড় ধরে টেনে তুলেছে। গোলাপী চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসেছে বাজিয়া। টলা পায়ে ট্রাকে গিয়ে বসেছে। সাঁওলীও বাজিয়াকে অনুসরণ করেছে।

ঝাঁপ ঠেলে ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণেশ। একি দেখছে সে! চোখ বিশ্বাস করবে, না করবে না? প্রকৃতির বুকে গড়ে ওঠা সরল শিশুর মনে-দেহে ক্রোধের গরল! নৃশংসতার চরম সীমায় পৌঁছুচ্ছে! অবাক কাণ্ড। এক মুহূর্ত দেরি হয়ে গেলে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কি হয়েছে—এসব জানবার সময় ঢের পাওয়া যাবে। কিন্তু এই পরিস্থিতিকে এখুনি সরাতে হবে।

বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকল কৃষ্ণেশ—সাঁওলী! নিরুত্তর সাঁওলী এগিয়েই চলেছে বাজিয়ার দিকে। তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে উত্তেজনায়। মাথা ভর্তি ঝাঁপান চুলগুলো দাঁড়িয়ে উঠেছে—আরো ফেঁপে উঠে মাথাটা দ্বিগুণ বড় দেখাচ্ছে। রক্তবর্ণ চোখ দুটোর স্থির দৃষ্টি। নিঃশ্বাস পড়ার সঙ্গে নাকটা ফুলে ফুলে উঠছে।

সাঁওলীর চেহারা বীভৎস দর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেকার

রমণীয়-কমনীয় সুঠাম অঙ্গের যৌবন-চাঞ্চল্যে ভরা প্রাণখোলা সাঁওলী মরে গেছে। তার জায়গায় প্রেতাত্মা ভর করেছে। এমনি প্রেতাত্মা নয়—রক্তখেকো শ্মশানচারী প্রেতাত্মা।

প্রেতাত্মাই হক আর দুরাত্মাই হক, কৃষ্ণেশ কাউকে পরোয়া করে নি কোনো দিন, মানতে চায় নি কোনো দিন। লাফিয়ে পড়ল। বাজিয়া-সাঁওলীর মাঝখানে। দৃঢ়মুষ্টিতে সাওলীর হাত দুটো চেপে ধরল। সাঁওলীর হাত থেকে কুকরি খসে পড়ে গেল। বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়ল কৃষ্ণেশের বুকের ওপর সাঁওলী। সাঁওলীকে শুইয়ে দিল কৃষ্ণেশ। তখনো একভাবে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে নির্জীব বাজিয়া। কৃষ্ণেশ অর্ধ-অচেতন বাজিয়াকেও ধরে শুইয়ে দিল। দুজনের মুখে-চোখে ঘাড়ে-পায়ে হাতে অনবরত জলের ছিটে দিতে লাগল। খানিক পর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলো ওরা দুজনে। লজ্জায় চোখ নীচু করে উঠে বসল সাঁওলী।—বাবু! তুমি।

—হ্যাঁ, আমি। তোদের দু'জনকে কাজে যেতে হবে এখুনি। শীগগির ট্রাকে উঠে বস!

কৃষ্ণেশের গলায় আদেশের সুর।

সাঁওলী বাজিয়ার গা ঠেলে, হেসে বলল, এই মুখপোড়া! বাবু কি বলছে শুনেছিস, না কানের মাথা খেয়েছিস? উঠে পড় শীগগির বলছি! মরণ দশা আর কি—আবার মুচকে মুচকে হাসা হচ্ছে—আমায় যেন পাগল ঠাউরেছে!

বাজিয়া সাঁওলীর চুলের ঝুঁটি ধরে, আদরে নেড়ে বলে—এই পাগলি! অত বকছিস কেন? তুই আগে উঠে বস দিকিনি মহারানী! নিজের ঘায়ে দাওয়াই লাগা আগে, তার পর অন্যের—

সাঁওলী-বাজিয়া দুজনে হাত ধরা-ধরি করে হাসতে হাসতে, গুন গুন করে, ওদের বহু পুরনো গানের কলি দুটোর সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ট্রাকে উঠে বসল। ট্রাক চলতে শুরু করল। ওরা গলা ছেড়ে গাইতে লাগল। ভাঙা সুরের কথাগুলো বলে বলে—তুমু দিই—জিকো এক থি বারো!

আশ্চর্য ব্যাপার ! এদের সবই বিচিত্র ! কৃষ্ণেশের মনে এই কথাগুলো ওলট-পালট করতে লাগল বার বার। ট্রাকে বসে বসে কৃষ্ণেশ কখনো গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, কখনো নিজের মনে হাসছে —ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছে, কখনো রাগে ফেটে পড়ছে। —এদের অসভ্যতায় ঘৃণা আসে, এদের সরলতায় আনন্দের ফোয়ারা ছোটে। এদের হিংস্রভাব দেখে রাগ হয়, বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে—প্রেম-প্রীতি ধূলিসাৎ হয়ে যায় নিমেষে।

মাস দুয়েক ধরে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছে কৃষ্ণেশ। এদের ভালোবেসেছে। নিজের করে নিয়েছে। এদের নিজের হয়ে গিয়েছে। তবু কি এদের চিনতে পেরেছে সে ? না—এরাও চিনতে পেরেছে তাকে ?

এই মাত্র যা দৃশ্য দেখেছে সে, সে দৃশ্য কি জীবনে ভোলবার ? রিনি জানলে এখুনি বলবে—ওসব খুনে লোকদের নিয়ে কাজ করান ভালো নয়—যারা খুন করতে যায় নিজের স্বামীকে, তারা যে তোমার ওপর কোনো দিন হঠাৎ হামলা করে বসবে না তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ? দরকার নেই এসব ব্যাপার নিয়ে রিনির কাছে গল্পগুজব করা। শেষে রিনি ঘাবড়ে যাবে। এখুনি চলে রাবার জন্যে তাগিদ দেবে। দিনরাত কেঁদে কেঁদে মরবে।

সপ্রশ্ন চোখ দুটো তুলে ধরল কৃষ্ণেশ বাজিয়া-সাঁওলীর মুখের ওপর। একটু আগে নিজে চোখে না দেখলে কৃষ্ণেশও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারত না যে এদের দুজনার মধ্যে একটা খুনোখুনি হতে চলেছিল আগে ! দুজনের মুখের ভাব একেবারে বদলে গেছে। এখানে আসবার পর গাঁয়ে যেয়ে লোক নির্বাচনের সময়ে বাজিয়া-সাঁওলীকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল আনন্দের প্রতিমূর্তি। পৃথিবীর কোনো রিপুই—কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদির মধ্যে কোনোটাই এদের স্পর্শ করতে পারে নি। ওসব এদের আওতার বাইরে। এবিষয়ে রিনির সঙ্গে আলোচনায় দুজনেই পরস্পরে সায় দিয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, এরা বহুরূপী। মুহূর্তে ভোল পাল্টাতে পারে।

আগেকার ভীষণ মূর্তি হিংস্রভাবের লেশমাত্র নেই সাঁওলীর মুখে!

কৃষ্ণেশের উৎসুক মন কথা কওয়ায়—প্রশ্ন করায়, তোদের কিসের ঝগড়া হয়েছিল রে বাজিয়া-সাঁওলী?

সংকোচ ওপচান গলায় বলল বাজিয়া—বাবু, ঝগড়া নয়।

—তবে কি?

—প্রেম।

হো-হো করে হেসে উঠল কৃষ্ণেশ। প্রেমেতে খুন হযে যেতিস যে—আমি না গিয়ে পড়লে কি হত জানিস? তুই তো পাথরের স্ট্যাচু হয়ে গেছলি সাঁওলীর ভয়ে!

—ভয়ে নয় নাবু, ওর ভালোবাসায় আমায় বেহুঁশী এসে গেছল।

আবারো দম ফাটা হাসিতে ফেটে পড়ল কৃষ্ণেশ।

—বাবু হেস না। আমি সত্যি বলছি। একটুও মিথ্যে নয়। আমায় এতো ভালোবাসে যে, আমি ওকে যা নয়, তাই বলেছি। ও সহ্য করতে পারেনি। কেন সহ্য করবে? ওযে ভালো মেয়েছেলে। খারাপ হলে অত রাগত না। সহ্য করে যেত। ও আমাকে মারবার জন্যে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি মুগ্ধ হয়ে ওর প্রেমের রূপ দেখছিলুম—নিজেকে ভুলে গিয়ে।

—নিজেকে ভুলে গেছলি? চিরদিনের জন্যে ভুলে থাকতে হত—ওই কুকরির ঘা খেলে?

—কুকরি মারতে পারত না বাবু। ও কিছুতেই পারত না। আমার বুকের কাছে এসে ওর হাত কেঁপে কুকরি পড়ে যেত। ও অন্য ধরনের হলে—অনেক সুযোগ পেয়েছিল। খুন করে পালাতে পারত জিতোর সঙ্গে। তা ও করেনি। আমায় রাগ দেখায়, ভয় দেখায়। দেখাক, কিন্তু বড্ড ভালোবাসে।

সাঁওলীর দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখল কৃষ্ণেশ। সাঁওলী লজ্জায় মুখ তুলে চাইতে পারছে না মোটে। সলজ্জ ঠোঁটের ফাঁকে নির্লজ্জ হাসিটি উঁকিঝুঁকি মারছে খালি।

ফিল্ডে দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে গেল বাজিয়া-সাঁওলী। ছুটির পরে প্রথম কাজে ক্লান্তি অনুভব করল না সাঁওলী। বরং নতুন আনন্দ—নতুন শক্তি পেল।

আশপাশ থেকে লাল, নীল, হলদে, সাদা বনফুল তুলে তোড়া বানাল।

কৃষ্ণেশ জিজ্ঞেস করল, কার জন্যে সাঁওলী, আমার জন্যে?

—না। রিনিমার জন্যে।

হাসপাতালে ফুলের তোড়া নিয়ে রিনি সাঁওলীর মধ্যে একটা হিংসের মিলনসুতো খুঁজে পেয়েছিল কৃষ্ণেশ। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সেটা তারই কল্পনার কুসন্তান। মনের ভুল। বিচারের ভুল।

কৃষ্ণেশের ফুর্তি আর ধরে না। নিজে হাতে ফুলগুলো রঙবাহার করে সাজিয়ে দিল সাঁওলীকে। একটা সাদা ফুল নিয়ে সাওলীর জড়ান এলোচুলে গুঁজে দিল। সাঁওলী তার ডান হাতের কনুইয়ের ওপরটা চেপে ধরল। বাজিয়ার নজর পড়ায়, ভড়কে গেল ও। আবার কি হল সাঁওলীর? ও জায়গাটায় কি ব্যথা? কাজ তো বেশ করে গেল ওই হাতে! একটুও বুঝতে পারা গেল না! কৃষ্ণেশের সামনে এসে বাজিয়া বলল, বাবু, সাঁওলীর ডান হাতটায় কি হয়েছে ও কিচ্ছু বলে না আমায় মনে হয়, ওর যন্ত্রণা হয় খুব—টিপে ধরে।

সাঁওলী লজ্জায় পড়ে। মুখে আঙুল দেয়। ইশারায় চুপ করতে বলে বাজিয়াকে। মুখে বলে—না, বাবু—কিচ্ছু হয়নি আমার হাতে। এমনি ধরি—টিপি।

কাজ সেরে তাঁবুতে ফিরল তিনজনে। বাজিয়া, সাঁওলী কৃষ্ণেশ।

বাইরে মোড়ায় বসে কৃষ্ণেশের প্রতীক্ষা করছিল রিনি। সাঁওলী এসে ফুলের তোড়াটা রিনির হাতে দিলে। রিনি আনন্দে আবেগ চাপতে না পেরে, জড়িয়ে ধরল সাঁওলীকে।

রিনি তার প্রায়শ্চিত্ত করলে সাঁওলীকে বুকে টেনে নিয়ে। একদিন ভুল ধারণার বশে অসাবধানে মুখ ফসকে এই সাঁওলীকে নিয়ে এমন একটা কথা বেরিয়ে যায় যে, পরে অনুশোচনা আপসোসের খচখচানিতে অস্থির হয়ে পড়ত মাঝে মাঝে রিনি। আজ সেই অস্থিরতার যবনিকা ফেলে দিল রিনি নিজে হাতে সাঁওলীকে বুকে টেনে নিয়ে। সাঁওলীরও মনের আঙিনায় ঘোরাফেরা করত রিনির ওপর একটা অজানা আশঙ্কা বিদ্বেষ। সেটাও দূরে সরে গেল রিনির উদার বুকের স্পর্শে। বাবুকে আটকে রাখতে চায় না রিনিমা। রিনিমা আটকে রাখলে বাবুর সাধ্যি কি সাঁওলীদের বাসায় আসে!

রিনি সাঁওলীর বুকের চাপে মাঝে পড়ে তোড়ার কতক ফুল থেঁতলে গেল। আহা-আহা করে কাছে এল কৃষ্ণেশ। রিনির হাত থেকে সাগ্রহে ফুলের তোড়াটা এক রকম ছিনিয়েই নিল।

কত কষ্টে ফুলগুলো যোগাড় করেছে সাঁওলী! আর কত মাথা খাটিয়ে সাজিয়েছি, রঙ বাহার করেছি রিনি। চেয়ে দেখ! মুষড়ে গেল নেতিয়ে পড়ল ফুলগুলো।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সমস্ত শরীরটা মাথা থেকে পা অবধি ঝিমঝিম কয়ে অবশ হয়ে গেল রিনির। তার সব শক্তিকে পায়ের তলার মাটি যেন টেনে নিচ্ছে। দাঁড়াতে পারছে না। রিনি কোনো কথা না বলে বসে পড়ল। তার মনে সংশয়—চোখে বিস্ময়।—এত এগিয়ে গেছে মুখার্জী!

সহজ আবহাওয়াটা ভারি হয়ে উঠতে লাগল। নিজেকে একটু সংযত করেই মাথা ধরেছে বলে, ভেতরে চলে গেল রিনি।

কৃষ্ণেশের মুখটা থমথমে হয়ে উঠল।

—স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ, ভদ্রতা থাকা উচিত রিনির মতো মেয়ের। ব্যবহার রিনি খুব ভালো করল না। এরা হতভম্ব হয়ে গেছে। সভ্য সমাজ হলে শিক্ষিত সমাজ হলে—রিনিকে বরখাস্ত হতে হত সমাজ থেকে। এরা সরল, কিছু বোঝে না যদিও, তবুও এদের মন নেই—একথা বলা যায় না। এদের সহজাত অনুভূতি থেকেই এরা

বেশ বোঝে—ভালোবাসা—অপমান। এটা কৃষ্ণেশের এখানে থেকে এদের সঙ্গে মেশার অভিজ্ঞতা।

কৃষ্ণেশ বাজিয়া সাঁওলীকে বিদেয় দিয়ে ভেতরে গেল। রিনি শুয়ে আছে, পাশে এসে বসল। গম্ভীর গলায় বলল—রিনি মনে চেপে না রেখে, খুলে বল সব! তোমার কি কোনো রকম সন্দেহ হয় কোনো বিষয়ে—

রিনি সজল চোখে চাইল।

—তোমার কি এখনো কাজ শেষ হল না মুখার্জী। মাস দুয়েক তো কেটে গেল। ক্রোমাইটেব স্যাম্পল নেওয়ার কি আর শেষ হবে না?

বিরক্ত ভরা গলায় বললে কৃষ্ণেশ। না। এখনো অনেক জায়গা বাকি। ছেলেখেলা করতে তো পাঠায় নি অফিস। কাজ সারা হলে কি পড়ে থাকে কেউ?

কথাগুলো বড় রূঢ় শোনাল। কি বলতে গিয়ে অভিমান ক্ষুব্ধ গলা দিয়ে স্বর বেরুল না রিনির। কেবল ঠোঁট দুটো অল্প কেঁপে উঠে থেমে গেল। গাল বেয়ে চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল টপ টপ করে।

অন্য সময় রিনির চোখের জল দেখলে সে ছোঁয়া কৃষ্ণেশের চোখেও লাগত। চোখের পাতাগুলো জলে ভিজে উঠত। কিন্তু বিয়ে হবার পর থেকে এই প্রথম ব্যতিক্রম হল কৃষ্ণেশের। রিনির কান্না দেখে, মুখ ঘুরিয়ে নিলে কৃষ্ণেশ—ছিচ কাঁদুনি আর ভালো লাগে না!

কৃষ্ণেশ রিনির কাছ থেকে, কোনো সান্ত্বনা না দিয়েই উঠে গেল। তার বিছানায় গিয়ে চুপ করে শুয়ে পড়ল।

আবার আগের মতো কৃষ্ণেশের তাঁবুতে আসতে শুরু করে দিল সাঁওলী। সকাল হওয়া মাত্র ঘুম চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরের বার হয় সাঁওলী। ঘুমন্ত বাজিয়াকে রেখে আসে একলা।

জিতো পেছু নেয় সাঁওলীর। সাঁওলীকে পাবার স্পৃহায় তার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। অনেক তোষামোদ খোশামোদ করেছে সাঁওলীর। কিছুতেই রাজী করাতে পারেনি। এখন প্রতিহিংসা জেগে ওঠে মনে সাঁওলীকে দেখলে।

জিতো যেমন জীবনে পেল না সাঁওলীকে, তেমনি বাজিয়াও না পাক। বাজিয়া তার মতো জ্বলুক। তবে তার শান্তি হবে। জ্বালা জুড়োবে।

সাঁওলীর পায়ে ধরে বলেছিল জিতো, বাজিয়াকে ছাড় সাঁও! আমার ঘরে চ!

সাপিনী ফণা তুলে ধরল, কামড়াল তাকে, সে বিষ আজো তার মাথা থেকে নামেনি। বিষে জরজর হয়ে আছে জিতো। লাথির বিষ। সাঁওলী তার ছাতিতে সদর্পে লাথি মেরে খেউড় করেছিল!

পঞ্চায়েতের সামনে মুখিয়াকে—প্রধানকে বলেছিল, জিতো আমায় ফুসলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে হরদম। পথেঘাটে হাত ধরে টানাটানি করে। ওর মুখ দেখতে চাইনে আমি। একবার বুকে লাথি মেরেছি, এবার মুখে মারব।

গ্রামসুদ্ধ লোকের সামনে লজ্জায় মাথা কাটা গেছল জিতোর। সেদিনকার অপমানের—বেইজ্জতির খেসারত আদায় করবার চেষ্টা

করেছে সে। সুযোগ পায় নি।

এত দিনে চাকা ঘুরছে। এবার সাঁওলীর বেইজ্জতির পালা। পঞ্চায়েতের সামনে বুক ফুলিয়ে তার ওপর টেক্কা দিয়ে, সাঁওলীর হাত ধরে নিয়ে চলে গেছল বাজিয়া। এখন দেখা যাবে কে রুখতে পারে বাজিয়ার ইজ্জত?

বাজিয়ার সঙ্গে ভাব জমাতে আরম্ভ করে দেয় জিতো সাঁওলীর অনুপস্থিতির অবসর সময়ে। কানে কানে ফিস ফিসিয়ে বলে—বন্ধু! শুনেছিস কি, কেন যায় সাঁওলী রোজ ভোরে? বাবুর কাছে যায় কেন? তুই লক্ষ করলেই নজরে পড়বে—সাঁওলী তোর চোখে ধুলো দিচ্ছে। ভালোবাসার বেসাতি করা সাঁওলীর স্বভাব। আমায় দেখেই বুঝে নেও! আমায় মজিয়ে ছাড়লে, শেষে তোমায় পেয়ে। এবার তো ছাড়ো ছাড়ো ভাব বাবুকে পেয়ে। ও সাংঘাতিক মেয়ে!

প্রথম যেদিন জিতোর কাছে সাঁওলীর কথা শুনল বাজিয়া, সে জিতোকে বিশ্বাস করতে পারেনি। গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল। খুন করে ফেলবে ভয় দেখিয়েছিল।

কিন্তু কেনোটাই তার ফলবতী হয়নি। জিতো ছাড়েনি তাকে। আরো জড়িয়ে ধরেছে। জোর গলায় বলেছে—আমার সঙ্গে আয়! দেখিয়ে দিচ্ছি চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে'খন।

রোখের বশে বাজিয়া বলেছিল, চল্।

তাঁবু থেকে খানিক দূরে শালগাছটাকে আড়াল রেখে ইশারায় দেখিয়ে ছিল সব জিতো।—সাঁওলী বাবুর পাশে দাঁড়িয়ে হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। খুশী উথলে পড়ছে সর্বাঙ্গ ছাপিয়ে। পাশে বসে আছে রিনিমা। কিন্তু রিনিমার দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই সাঁওলীর! রিনিমা বিষণ্নের প্রতিমূর্তি হয়ে উদাসীন চোখে শূন্যে তাকিয়ে আছে। আহা! সোনার প্রতিমার কি দশা!

—দেখলি তো কিরকম ঢলাঢলি! বাবুর হাত ধরে টানাটানি! তোমার ইজ্জতের গলা টিপে মারছে সাঁওলী!

জিতোর শয়তানী বুদ্ধি জানত বাজিয়া। ওর কথায়, দেখান, তবু তার মন টলাতে পারেনি। জিতো জানে না—বাজিয়া বাবুকে দেবতা ভাবে। সাঁওলীও তাই ভাবে। সাঁওলীর ওপর অবিশ্বাস এলে আসতে পারে, কিন্তু বাবুর ওপর নয়। নিজের কান-নাক ম'লে, জোড় হাত করে বনের দিকে চেয়ে বলেছিল বাজিয়া—হে ঠাকুরানী বন-মাতা! অপরাধ নিওনা, অপরাধ নিওনা, অপরাধ নিওনা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছল জিতো। তীর ঠিক জায়গায় লাগল না। বিঁধল না। লক্ষভ্রষ্ট হল। কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জিতোর কাছে শোনা কথা, দেখান ব্যাপার সবই বলেছিল বাজিয়া সাঁওলীর কাছে। গোপন করেনি কিছু। অবিশ্যি কাজের সময় নয়। বাবু কাছে থাকে। যদি শুনে ফেলে—ছিঃ ছিঃ! মরমে মরে যাবে বাজিয়া তাহলে। আর মুখ দেখাতে পারবে না কখনো। তাই ডেরায় ফিরে একান্তে বসে বসে পাটি পেতে বসেছিল বাজিয়া।

শোনা শেষ হ'লে সাঁওলী বলেছিল—জিতো তো বলবেই। ও তোকে ধোঁকা দিয়েছে! পাছে জানতে পেরে ওর মুণ্ডুটা তুই নিস, তাই—

ওর কাছে রোজ যাই আমি। শোন, সত্যি বলছি। পরে বাবুর কাছে। ওটা জিতোই শিখিয়েছে—তোর চোখবন্ধের চাতুরি ওটা। তোকে বুদ্ধু বানাবার ফন্দি স্রেফ। বাবুর কাছে আমায় দেখলে, ওর কাছে যাওয়াটা চাপা থাকবে। আমি ওর কাছে যাই কেন জানিস—ওর বাড়টা দেখবার জন্যে—ওকে শেষ করবার সুযোগ খোঁজবার জন্যে।

খুশীতে চোখ দুটো চকমক করে ওঠে বাজিয়ার। সাঁওলী হাত দুটো নাড়া দেয়। আমি ঠিক করে দেব শা—জিতোকে। তুই ওকে মেরে হাতে ময়লা লাগাতে যাবি কেন?

পরের দিন জিতো এসেছিল ঠিক সময়। সাঁওলী ছিল। দেখে

পালিয়ে যায়। তারপর আরো দু-তিন বার বাজিয়াকে পাকড়াও করবার চেষ্টায় ছিল ও। আশা পূর্ণ হয় নি। সাঁওলী আর বাজিয়াকে একলা ফেলে বেরোয় না। নিয়ম করে রোজ দুবেলা—সকাল-বিকেল—কাজে যাবার আগে আর কাজ সারা হবার পর—ঘরে ফেরবার সময়—দুজনে এক সঙ্গে কৃষ্ণেশের তাঁবুতে হাজির হয়।

সাঁওলীর মন চায় দিন-রাত বাবুর সঙ্গে থাকতে। বাবুকে তার বড় ভালো লাগে। চব্বিশ ঘণ্টাও দিনরাতের মধ্যে বারো ঘণ্টা কাটায় সাঁওলী—সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যে ছ'টা। তবু তার কৃষ্ণেশের কাছে থাকা হয় না। বারো ঘণ্টা যেন এক নিমেষে কেটে যায় সাঁওলীর—কোথা দিয়ে কাটে, সাঁওলী বুঝতে পারে না। ধরতে পারে না। সময়ে সময়ে সাঁওলী ভাবে—রিনিমা কত সুখী! কত ভাগ্যবতী! রিনিমার মতো হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করত সে। রিনিমা! রিনিমা এমন স্বামী পেয়েও দুঃখী। ওঁকে দেখলেই বোঝা যায়। বাবু কত ভালোবাসে, এত সাজায়-গোজায়—তবু তার মন পাবার যো নেই। সবেতেই মুখ ভার—মুখে হাসি নেই। দেখলে গা জ্বালা করে। বাবুর কি অশান্তি! রিনিমার ওপর রাগ হয় তার এই জন্যে। মনে হয়—

সাঁওলী রিনির সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছে অনেক দিন। রিনিও সাঁওলীর ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার। রিনি কৃষ্ণেশের সঙ্গে বেশ হাসছে, কথা কইছে—যেমনি সাঁওলী এসে দাঁড়াল, হেসে গড়িয়ে পড়ল কৃষ্ণেশের গায়ে, অমনি রিনির বাকশক্তি যেন কেড়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে। মুখের হাসি মুখেই রয়ে গেল। ঠোঁটের পেছনে মিলিয়ে গেল। অবিশ্যি সাঁওলীকে দেখলে নিজের এ ভাবটাকে গোপন করতে চেষ্টা করেও সফল হতে পারে নি রিনি। বরং চাপতে গেলে মুখে-চোখে আরো ফুটে ওঠে। অনেকবার কৃষ্ণেশ সাবধান করে দিয়েছে, রিনি, ওদের নিয়ে আমার কাজ চালাতে হবে। ওদের মনে যদি কোনোরকম ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, তোমার ভালো লাগছে না ওদের, তুমি ওদের ওপর খারাপ মনোভাব পোষণ কর—

তাহলে ফল ভালো হবে না মোটে। যে কাজ করতে আসা, সে কাজে দল বেঁধে বাধার সৃষ্টি করবে নানান দিক থেকে—কাউকে কাজে আসতে দেবে না। আমাদের কাজ-কর্ম সব পণ্ড হয়ে যাবে। ওদের চটিয়ে দিয়ে বিপদকে তাড়াতাড়ি টেনে এনে কোনো লাভ নেই।

কৃষ্ণেশের বোঝানয় রিনির মাথার রক্ত চন চন করে ওঠে।—মুখার্জী কী? চায় তার চোখের সামনে হাসি-মশকরা ঢলাঢলি—কিছু তো আর বাদ যাচ্ছে না। সে নির্বিবাদে সহ্য করে চলেছে! মুখ খোলে না একটি বারও। চোখের সামনে অন্য মেয়েছেলে নিয়ে মাতামাতি কোন স্ত্রী সহ্য করতে পারে? মুখার্জী চায় কি সে সাঁওলী পদানত দাসী হয়ে থাকুক—বাঁদী হয়ে থাকুক! কাজের অজুহাত দেখিয়ে, বিপদের ভয় চুকিয়ে—হাসি না এলেও জোর করে হাসাতে—কথা কইতে ইচ্ছে না করলেও কথা কওয়াতে? সে পারবে না। কিছুতেই না! বরাতে যা আছে হক।

তার নয় মুখ ভার করা চলবে না সাঁওলীদের সামনে—কি—না, ব্যথা পাবে ওরা। মুখ ভার করলে নাকি তার মনের প্যাঁচোয়ারি, নোংরামি স্পষ্ট ফুটে ওঠে মুখে! সেই জন্মেই তাকে আর ভালো লাগে না মুখার্জীর। এমন এমন আচার ব্যবহার করছে সে, যে মুখার্জীর কাছে সে সব ক্ষমার অযোগ্য—বরদাস্ত করা অসহ্য!

রিনির চোখের জলে দিনরাত কাটতে থাকে।—এই মুখার্জী তাকে বিয়ের পর হাসিমুখী বলে ডাকত—আর আজ? আজ নাকি সে ডাইনীমুখী! ডুকরে কেঁদে উঠে রিনি।—একি হল তার? সে কি করবে, কোথায় যাবে? বড় নিঃসহায় বলেই এই রূঢ় ভাষা বলার সুযোগ পাচ্ছে মুখার্জী। ধমকাচ্ছে দিন-রাত।

রাতে শোবার সময় পায়ে হাত বুলোয় কৃষ্ণেশের—মন ঘোরানর জন্যে! রিনির ব্যথা-গলা চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা হয়ে কৃষ্ণেশের পায়ের পাতায় ঝরে পড়ে। অস্থির হয়ে ওঠে—আঃ, রাতেও কি একটু ঘুমোবার উপায় নেই! আশ্চর্য!

কৃষ্ণেশের পা দুটো বুকে চেপে ধরে রিনি। বলে, আমার অনুরোধ! দু'টো কথা শোন, ভুল বুঝনা! আমায় বলতে দাও! নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।

রিনির বুক থেকে পা দু'টো ছাড়িয়ে নিচ্ছে কৃষ্ণেশ। উঠে বসল। গলার স্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল—তুমি কি চাও, বল! সারা রাত ধরে আজ আমি তোমার সব কথা শুনব। কিন্তু একটা শর্ত, এই আমার শেষ শোনা। এর পর আর কোনো অনুরোধ উপরোধ শোনা হবে না।

কৃষ্ণেশের কথাগুলো রিনির বুকে শেল হয়ে বিঁধল। কান্নায় ভেঙে পড়ল রিনি। কান্না-ভেজা গলায় বলতে লাগল—তুমি তো এমন ছিলে না এর আগে! এতো উগ্র মেজাজ তো তোমার ছিল না। যদি অন্যায় করে থাকি, ক্ষমা কর। আমার অনুরোধ—চল, আমরা ফিরে যাই!

নিজের মনের সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করছি, পেরে উঠছি না। এক দৃষ্টে চেয়ে আছে রিনির চোখের দিকে, ঠোঁট নড়ার দিকে কৃষ্ণেশ।—রিনি কত সরল! মনে ভেজাল নেই, বিশুদ্ধ পবিত্র।

রিনির বলা থেমে গেল।

কৃষ্ণেশ স্নেহ-স্নিগ্ধ গলায় বলল—তুমি কিসে শান্তি পাও বল—আমি তাই করব, সেই ভাবেই চলব।

রিনির ভীরু গলা কেঁপে উঠল। ভয়ে ভয়ে—তুমি সাঁওলীকে অন্তত এখানে আসা বন্ধ কর। বাইরে চোখের বাইরে—আমি দেখতে পাব না কিছু। আমার মন ঠিক থাকবে।

কৃষ্ণেশের চোখে বিস্ময়—কেমন করে হয় রিনি! যেখানে নিত্যি আসা-যাওয়া, হট করে বারণ করলে—যা ভয় করেছিলুম, তাই ঘটবে শেষে। ওরা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। রিনি চুপ করে রইল। মুখখানা থমথমে হয়ে গেল আবার। উঠে গেল কৃষ্ণেশের কাছ থেকে।

কৃষ্ণেশ রিনির কাছে এসে বললে—রিনি! ও যখন আসবে—আমি কাজের অজুহাতে সরে সরে থাকব। কাছে থাকব না। তাহলে

তুমি সন্তুষ্ট তো? কেমন? রিনির ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা ভেসে উঠল। এরপর—এরপর কৃষ্ণেশ তার কথা মতো ঠিক কাজ করে চলেছে—সাঁওলীকে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। কৃষ্ণেশ সাঁওলীর কাছ থেকে যত দূরে সরিয়ে রাখতে লাগল নিজেকে, ততই অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিতে লাগল রিনির মধ্যে।

রিনির সৌজন্য-বোধ বেড়ে গেল। ভদ্রতায় যত্নে মুগ্ধ হয়ে গেল কৃষ্ণেশ। আশ্বস্ত হল যাক, তার আগেকার রিনি ফিরে এসেছে আবার। সাঁওলী বাজিয়াকে সে এত আপনার করে নিতে পেরেছে, শীগগির—এটা মস্ত শক্তি রিনির—মস্ত গুণ ওর।

তাঁবুর ভেতর বসে বসে, কাজের অভিনয়ের ফাঁকে সব লক্ষ রাখে কৃষ্ণেশ। পরিতৃপ্তির জোয়াবে ভাসতে থাকে কৃষ্ণেশেব পথ-খুঁজে-পাওয়া মন। বেশ কাটছিল দিনগুলো আনন্দ-হাসি-খেলা-কাজের মধ্যে। রিনির উদাস মন-মরা ভাবটা আর নেই। কেটে গেছে। সদাসর্বদা হাসিখুশী ভাব। কৃষ্ণেশ যখন ডাকে, হাসিমুখী বলে ডাকে।

সাঁওলী কৃষ্ণেশের সঙ্গ না পাওয়ায় প্রথমে ক্ষেপে উঠেছিল। মনে মনে দিনরাত মুণ্ডুপাত করত রিনির। মরণ আর কি। আটকে রাখা হয়েছে বাবুকে?

দেখা যাক কদিন আটকাতে পারে। সাঁওলী পেছু লেগে থাকবেই বাবুর। সে নাছোড়বান্দা। আহা-হা হা। বুদ্ধি কত! এখানে আটকান হচ্ছে—বাইরে কাজে!

রিনির আন্তরিকতায় সাঁওলীব আক্রোশের আগুন আস্তে আস্তে নিভে গেল। রিনিমার কোনো দোষ নেই। বাবু তো সকাল বিকেল অফিসের নকশা, কাগজের টেবিলে ছড়িয়ে, মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে অফিসেব কাজ করে—কাজের চিন্তা করে নিশ্চয়।

রিনি-সাঁওলী-কৃষ্ণেশ তিন জনেরই মনের কালো জমাট মেঘ হালকা হয়ে গেল—কেটে গেল। কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়—আবার আস্তে আস্তে কালো মেঘ জমতে শুরু করে দিল—কৃষ্ণেশ কাজে বেরিয়ে গেলে—জিতো এসে এসে—ফিল্ডে, বাবু-সাঁওলীর কেচ্ছা-কাহিনী শোনাতে লাগল।

—জিতো নাকি প্রত্যক্ষদর্শী। সে স্বচক্ষে দেখেছে সব। ঝোপের আড়াল থেকে—সাঁওলী বাবুর বুকের ওপর মাথা রেখে শুয়ে—জিভ কেটে জিতো চুপ করে যায়। কি বলতে কি বলে ফেললুম মা! নাম করো না যেন! ওরা মাগী-মিনসে খুনে—একের নম্বর হারামি। তুমি ফিল্ডে যাবার নাম করে দেখ না? বাবু নিয়ে যেতে গররাজি হবে নিশ্চয়। পাহাড়ি জায়গা, ঘন জঙ্গল! বাঘ-ভালুকে ভরা! বিষাক্ত সাপের ভয়ও আছে—নানান অজুহাত দেখাবে।

জিতোর কথা শুনে, রিনির সর্বশরীর থর-থরিয়ে উঠছিল। মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেছল। বুকের ধুক-ধুকুনি বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। হাত পা হিমশীতল হয়ে আসছিল। দেহ হালকা হয়ে টলে পড়ছিল। পাশে দাঁড়িয়েছিল রামবাহাদুর। ধরে ফেলল রিনিকে। তাঁবুর ভেতর শুইয়ে দিয়ে, এক গ্লাস জল খাইয়ে দিয়েছিল—আশ্বস্ত করেছিল—সান্ত্বনা দিয়েছিল, আমি সব শুনেছি। কিছু ভাববেন না। ব্যবস্থা করছি আমি। সাঁওলীকে দেখছি।

নিস্তেজ হয়ে শুয়ে থাকলেও রিনি অচেতন হয় নি। সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল ভেতরে। রামবাহাদুরের কথা শুনে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল

রিনি। আস্তে আস্তে বলল, কোনো গণ্ডগোল করো না রাম? তুমি আমার ছেলের মতো, হাঙ্গামা করতে যেও না। তার চেয়ে কাল-পরশু আমায় কলকাতা দিয়ে এস।

রামবাহাদুর নিজের মতামত কিছু প্রকাশ করেনি। খালি রিনির কথা বলার সঙ্গে মাঝে মাঝে 'জি, জি' বলে চলেছিল।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে, জিতো সারাটা পথ একটা প্রতিহিংসার বিষাক্ত নেশায় বিভোর হয়ে চলছিল! সেই নেশার আমেজে অফুরন্ত ফুর্তির ঢেউ খেলে যেতে লাগল জিতোর প্রতিবারের নিঃশ্বাস টানা-ছাড়ায়। জিতো খানিক পথ এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। ঢেউ খেলান ছোট সাদা পাহাড়কে দেখছে সে। এ পাহাড়কে চুরমার করে দেবে জিতো। ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে নয়। তার বুদ্ধিতে—কৌশলে। ফাটল ধরিয়েছে খানিক সে। এই ফাটলে পাহাড় কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে। এত সহজে কার্যসিদ্ধ করতে পারবে ধারণার অতীত ছিল। পাহাড়ের মূলে আঘাত হেনেছে জিতো। পাহাড উপড়ে পড়বে। মুখ থুবড়ে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে নিজেকে খণ্ড খণ্ড—টুকরো টুকরো করে ফেলবে! কেউ বাঁচাতে পারবে না একে।

আবার চলতে লাগল জিতো। জোরে জোরে লম্বা পা ফেলে চলছে সে। তার এক এক পায়ের চাপে পাহাড়টা নড়ে উঠছে। থর-থরিয়ে কেঁপে উঠছে। জিতোর পুলকে বুক ফুলে দশ হাত হচ্ছে।

—হ্যাঁ, নিজের বুদ্ধির তারিফ, নিজেকেই করতে হয় দেখছি। জিতো আবার ফিরে চাইল। এমন জায়গায় ঘা দিয়েছে সে—সেই ঘায়ের আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়বে সাঁওলীর বুকে—বাজিয়ার হৃৎপিণ্ড জ্বলে জ্বলে গলে পড়বে। আর তাই দেখবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিতো। জিতোর বুকের আগুন নিভবে তখন—জ্বলুনি থামবে তখন।

জিতো যে সাদা পাহাড়ের মূল নাড়িয়েছে, সে সাদা পাহাড়

নামেই পাহাড়—পাথরের নয়। কাপড়ের—তাঁবু। কৃষ্ণেশের সাদা তাঁবু—আর পাহাড়ের মূল রিনি।

কৃষ্ণেশের ভেতরটায় গরম মনের পাশে একটি নরম মনের ছোট্ট শিশুও খেলা করে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। যখন সে শিশুটি জেগে ওঠে, তখন কৃষ্ণেশের আলাদা মূর্তি—আলাদা প্রাণ। সে মূর্তির কাছে—এই প্রাণের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল রিনি। রিনি ভুল করে ছিল একথা মোটেই বলা যায় না, অন্তত রিনির ক্ষেত্রে। সে যে ভুক্তভোগী —নিজের চোখে দেখেছে দেবতার মূর্তিতে কৃষ্ণেশকে। চোখকে অবিশ্বাস করবে কেমন করে সে? হ্যাঁ, চোখে দেখার যে ভুল হয় না এমন, তা নয়, কিন্তু—কিন্তু একবার নয়, দু'বার নয়—বারবার যে রিনি দেখেছে। ভালো করে দেখেছে। শুধু বাইরের চোখে নয়, তায় মনের চোখ বাইরের চোখ এক করে দেখেছে।

কৃষ্ণেশের প্রাণ? প্রাণের পরিচয়ও পেয়েছে নিজের প্রাণে প্রাণে। একদিন সে প্রাণ না পেলে রিণির প্রাণের পরমায়ু ফুরিয়ে যেত পৃথিবী থেকে। রিনি হারিয়ে যেত অনেক দিন। রিনির জীবনের নতুন অধ্যায়ের জন্ম হত না আর।

সেই কৃষ্ণেশ আর সেই রিনি। তবে? কেন এ পরদা পড়ে গেল দু'জনের মাঝখানে। চোখে হাতচাপা দিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল রিনি! একি শুনিয়ে গেল জিতো তাকে—মুখার্জী মিথ্যে বলতে জানে না—কিন্তু আজ—আজ মুখার্জী—তার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা—মুখার্জীর বুকে মাথা রেখে সাঁওলী—

—না, না কখনোই হতে পারে না! এ বিশ্বাস করতে পারবে না সে! কিছুতেই না।

রামবাহাদুরকে ডাকল রিনি। কোনো সাড়া পেল না। বাইরে তখন বৃষ্টির ঝমঝমানি আওয়াজ। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। জষ্টির মাঝামাঝির বৃষ্টি।

রিনির অত অশান্ত মনেও, বৃষ্টির ভেজা-হাওয়ায় শান্ত পরিবেশ তৈরি করল। হতাশার মাঝে আশার বিদ্যুৎ লুকিয়ে সরে গেল।—

আর কটাদিন ? বর্ষা শুরু হচ্ছে। কাজ বাকি থাকলেও ফিরতে হবে কৃষ্ণেশকে।

তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করল, নাইতে ইচ্ছে করল রিনির। একমাত্র বৃষ্টিই তাকে বাঁচাতে পারে। কৃষ্ণেশকে ফেরাতে পারে। বৃষ্টিই তার প্রধান বন্ধু এখন!

আকাশের দিকে চেয়ে, অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশে কাতর প্রার্থনা করলে রিনি, বর্ষা তুমি এস! যেও না আর! আমার অনুরোধ রাখ! রিনির চোখের জল আর বৃষ্টির জল এক হয়ে বুক গড়িয়ে পড়তে লাগল।

দূরে রামবাহাদুরও আমতলায় বসে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। বাঁশিতে ওর বহুবার গাওয়া গানটাকে সুরের কেরামতিতে নাচিয়ে তুলছে—পানির পড়ইয়ো লৌত রিমি জিমি···রিম ঝিম বারি ধারা ঝরে বরষায়···। ভিজে-হাওয়ায়—বাঁশির সুরে ভেসে আসতে লাগল রিনির কানের পরদায় নেপালের বর্ষা-সংগীত। রিনির কানে মধু ঢেলে দিল। বাঁশির সুর তাকে টেনে নিয়ে গেল আমতলায়।

আমতলায় বসে বসে ভিজছে রামবাহাদুর। চোখ বুজে তন্ময় হয়ে বাঁশি বাজিয়েই চলেছে একভাবে। রিনি পেছনে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি-ভেজা আমপাতা-ঝরা বড় বড় জলের ফোঁটা বাতাসে ভয় করে এধার-ওধার ছিটকে পড়তে লাগল। রিনির গায়ে মাথায়। রাম-বাহাদুরেরও। বাঁশি থামল। চোখ চাইল রামবাহাদুর। পেছন ফিরে দেখে অবাক হয়ে গেল। গাছ ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রিনি। রিনির মুখে ফুটে বেরুচ্ছে স্বর্গীয় দীপ্তি—অপূর্ব জ্যোতি! যেন ধ্যানমগ্না গৌরী। পশুপতিনাথের স্ত্রী পার্বতী। আহা! এই দেবীর সর্বনাশ করেছে সাঁওলী! দেবীকে দুঃখ দিচ্ছে! রামবাহাদুর প্রতিজ্ঞা করল মনে মনে। সে রিনিমাকে আম্মা বলেছে—রিনিমা—ধর্ম মা। রিনিমার জন্যে প্রাণ দিতে হয়—দেবে সে।

জিতো লোকটা খুব ভালো। বড় পরোপকারী। রাম-বাহাদুরকে ডেকে—সেধে সেধে ভাব জমিয়ে ছিল। প্রথমে রাম-

বাহাদুরের জিতোকে দেখে একটুও ভালো লাগেনি। ওর চোখ দুটো বদমাইশি মাখান। কিন্তু বাবুর কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় রাম-বাহাদুর—সে যা ভেবেছিল লোকটাকে—লোকটা তা নয়, কত বড় হিতাকাঙ্ক্ষী তাদের। আম্মা-র সঙ্গে দেখা করান বিশেষ দরকার। তাই দেখাও করিয়ে দিল আম্মা-র কাছে নিয়ে গিয়ে।

আম্মা যে জিতোর কথা শুনে এত মুষড়ে পড়বেন—এত ভেঙে পড়বেন—এটা আগে বোঝেনি সে। সে ভেবেছিল, আম্মা আদেশ করবেন—বাহাদুর! সাঁওলীকো দুনিয়াসে হটা দিও! কিন্তু আম্মা সে আদেশ দিলেন না। উল্টে বারণ করলেন অন্যায় কিছু করতে। না হলে আজই একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যেত।

দাঁতে দাঁত চেপে ধরে রামবাহাদুর।—সাঁওলী আম্মা-র দুশমন জানলে—তাকে কুকরি দিত কখনো সে। কত ন্যাকামি করে আদায় করেছিল।—তোদের একটা জিনিস—অন্তত ভোজালিটা উপহার দাও! এটা বড় ভালো—বড় ধারাল। আমাদের অস্ত্র-গুলো এরকম নয়।

শয়তানীর চালাকি বোঝেনি রামবাহাদুর। সরল প্রাণে খাপ-সুদ্ধ তক্ষুনি দিয়েছিল। সাঁওলী কুকরিটা নিয়ে, হাসতে হাসতে দৌড়ে পালিয়ে গেছল। এখন সে বেশ ভালো ভাবে বুঝেছে—এর ভেতর উদ্দেশ্য ছিল—মতলব ছিল—ছল-চাতুরি ছিল। তাকে নিরস্ত্র করে রাখবার দরকার ছিল সাঁওলীর।

সাঁওলী ভুল করেছে। তাকে নিরস্ত্রভাবে বাবুকে নিয়ে হল্লা করবে। মাকে কাঁদাবে! এ বরদাস্ত করতে পারবে না সে। কখনো না। তার আরো ভালো বড় কুকরি আছে এখনো প্যাটরার ভেতর।

কেটে গেল মিনিট পাঁচেক। তখনো চোখ বুজে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রিনি। বাঁশির সুরের রেশ রিনির প্রত্যেক অনুভূতি-কেন্দ্রে বেজে চলেছে।

অস্থির হয়ে পড়ল রামবাহাদুর! এক তো আম্মা ভিজে সপ-

সপে হয়ে গেছে। গায়ে জল বসেছে। সুখী মানুষ। তাদের মতো রোদে পোড়া জলে ভেজা অভ্যেস নেই তো আর! অসুখ করবে।

রামবাহাদুর খুব আস্তে আস্তে বিনয়নম্রস্বরে ডাকলে—আম্মা! আম্মা! আম্মা! একবার। দুবার। তিনবারের পর রিনি যেন শুনতে পেল। চোখ চাইল। চোখ দুটো লাল করমচা।

রামবাহাদুর বললে—আম্মা, তাঁবুতে চলুন।

রিনি তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। রাতে রিনি বেহুঁশ স্বরে ভুল বকতে লাগল। জিতোর মুখে শোনা কথাগুলো বার বার উচ্চারণ করতে লাগল—বাবুর বুকে মাথা রেখে সাঁওলী চিৎকার করে উঠতে লাগল—না, না, কখখনো না। মুখার্জী বিশ্বাসঘাতক—

কৃষ্ণেশ সারারাত চোখেপাতায় করেনি একটুও। ঠায় রিনির মাথার কাছে বসে বসে কাটিয়েছে। বিকারের ঘোরে, রিনির মুখ দিয়ে বেরন কথাগুলো শুনে হতভম্ব হয়ে গেছে—

—সে কি করবে এখন? রিনির দেহের চেয়ে মন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রিনির কিছু হলে—কৃষ্ণেশ পাগলের মতো বেহুঁশ রিনিকে জড়িয়ে ধরে—না না, রিনির কিছু হবে না, হতে পারে না। সচেতন হয়ে উঠল কৃষ্ণেশ রিনির জল চাওয়ার ক্ষীণ কণ্ঠের ডাকে।

জল দিল কৃষ্ণেশ। রিনির জ্বর কমের দিকে—নীচের দিকে নামছে সবে। কপালে ঘামের ফোঁটার সারি।

উৎফুল্ল হয়ে উঠল কৃষ্ণেশ।

রিনি! কেমন বোধ করছ? হঠাৎ এরকম জ্বর হল কেন। রিনি একটু করুণ হাসি হাসল। বড ভালো লাগল সে হাসি কৃষ্ণেশের। কিন্তু বুকে খচখচ করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে একটা অব্যক্ত ব্যথা।—রিনি কষ্ট পাচ্ছে! সুস্থ হয়ে উঠুক!

তিনদিন ধরে সর্দি কাশি জ্বরে ভুগল রিনি। কৃষ্ণেশ দিন রাত —নাওয়া খাওয়া—ঘুম সব ত্যাগ করে রিনির সেবা-শুশ্রূষা করল। শহর থেকে হাসপাতালের ডাক্তার আনল—পেনিসিলিন চিকিৎসা

করা হল। নিউমোনিয়া হবার উপক্রম হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা হওয়ায় রিনিকে ভুগতে হল না বেশি দিন।

রিনি ভালো হয়ে উঠল—এখন ওর মুখের প্রধান বুলিই হয়েছে—মুখার্জী, তুমি আমার কাছে কাছে একটু থাক। কোথাও যেও না আমায় ছেড়ে। আমার কেমন ভয় হয়।

কৃষ্ণেশ আদর করে রিনির গালে টুসকি মেরে হেসে বলে—তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না রিনি। তুমি এ দুর্ভাবনা ছেড়ে দাও!

প্রায় দিন ন' দশ কাজ-কর্ম বন্ধ। বর্ষা নামবে শীগগির। আর বসে থাকা উচিত নয়। কাজ শেষ করে ফিরতে হবে। কৃষ্ণেশের কথাগুলো শুনে রিনির চোখে খুশীর ঝিলিক মেরে গেল।

কৃষ্ণেশের বুকের ওপর মাথা রেখে বলল রিনি—তাই কর, কাজ-কর্ম সার এবার!

—তুমি মত দিচ্ছ তো? তবে আজ থেকে বেরুই!

রিনি হ্যাঁ বলতে গিয়ে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল—না!

—সে কি! তাড়াতাড়ি ফেরা হবে কেমন করে?

রিনির মুখে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল। রিনি একদৃষ্টে চেয়ে আছে কৃষ্ণেশের দিকে। কিন্তু সে চাউনি কৃষ্ণেশের দিকে হলেও অন্য কিছুর দিকে। রিনির নিজের মনের দিকে—তার মনে কৃষ্ণেশের ব্যাপার যে ভাবে গাঁথা হয়ে আছে—সেই দিকে। রিনি শিউরে উঠল। রিনির চোখ দুটো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

আকুতি মেশান কথায় রিনি বলল—আমায় সঙ্গে নিয়ে চল!

—তোমায় সঙ্গে! বিস্ময়ে রিনির মুখের দিকে চেয়ে থাকে কৃষ্ণেশ।

বোঝাতে চেষ্টা করলে তোমার কষ্ট হবে। কোথাও ট্রাকে, কোথাও পায়ে হাঁটা পথে যেতে হবে। অত ধকল শরীরে সইবে না। উত্তেজনায় রিনির মুখ লাল হয়ে উঠল। —জিতো তো ঠিক কথাই বলেছে!

রিনি জিদ ধরল, সে যাবেই! অগত্যা কৃষ্ণেশের রাজি হওয়া ছাড়া আর উপায় কি! তবু কৃষ্ণেশ আর একবার শেষ চেষ্টা করল রিনিকে নিরস্ত করতে। —এখনো বোঝ। রোদ্দুর, জল, বুনো-জানোয়ারের উৎপাত।

রিনি বিরক্ত হয়ে উঠল, তোমাদের যদি এতদিনে কিছু না হয়ে থাকে, না মরে থাক—শেষের কথাটা বলে ফেলে রিনি চুপ করে গেল—ছিঃ! মাথাটা বেঠিক হয়ে গেছে তার একেবারে! কি বলতে কি বলছে! মুখ দিয়ে যত সব অমঙ্গল কথা!

রিনির স্তব্ধ-মৌন ভাবে কৃষ্ণেশের আতঙ্ক হল। আবার না রিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে। রিনির মনটাকে অন্য ধারে ঘোরাবার চেষ্টা করলে।—তুমি তৈরি হও! সঙ্গে যাবে। রিনি নিশ্চিন্তের নিঃশ্বাস ফেললে।

ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড় না রেখে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল কৃষ্ণেশ বাজিয়া সাঁওলীকে। অবিশ্যি রিনিকে বাঁচাবার জন্যেই বলেছিল সে —রিনির অসুখের সময়।

—ডাক্তারবাবুর বারণ রিনির কাছে লোকজন আসা। তোরা এখন আসিসনে। তোদের মজুরি আমি নিজের থেকে দিয়ে যাব। ভাবিসনে। আর এসেই বা করবি কি? রিনির খবরাখবর লোক মারফত ঠিক পাবি। যা কাণ্ড বেধেছে, সবই তো শুনেছিস জিতোর কাণ্ডকারখানা। জিতো বিষাক্ত সাপ। রিনিকে এমন ছোবল মেরেছে যে, সে বিষ টপ করে নামা মহাশক্ত ব্যাপার।

রামবাহাদুরটাকে পটিয়ে পটিয়ে এই সর্বনাশ করে গেছে জিতো।

রায়বাহাদুরের মুখে যখন শুনলুম সব, তখন আমার কি অবস্থা বোঝ! মাথা ঘুরে গেল আমার। কি করে প্রাণে বাঁচবে রিনি—এই চিন্তা মাথায় বনবন করে ঘুরতে লাগল। তাও কাল ও ব্যাটাও ভয়ে কিচ্ছু বলেনি। জিতো এই সব বলে গেছে—জলে ভিজেছে খুব রিনি। আজ ডাক্তারবাবুর বুক এগজামিনের পর সর্দি বসার কারণ বারবার জিজ্ঞেস করায়, ডাক্তারবাবুর কাছে বলে ফেলে, জলে ভেজার কথা। পরে অন্য সব কথা বলে আমায়।

এরপর থেকে সাঁওলী বাজিয়া আসেনি। সাঁওলী অনেক বার আসবার জন্যে ছটফট করেছিল। রিনিকে দেখবার জন্যে নয়। কৃষ্ণেশের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। বাজিয়া আটকেছে—তোর যাওয়া উচিত নয় সাঁওলী। মায়ের কি অবস্থা তো বুঝছিস। তাছাড়া বাবুর মনের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। এসময় তাঁকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। খবর—টাকা সবই তো বাবু পাঠাচ্ছে। এখন কাজ নেই যখন, মিছিমিছি যাবিই বা কেন?

বাজিয়ার কথাগুলো ভালো লাগেনি সাঁওলীর। কেন লাগবে? বাবু রিনিমাকে নিয়ে পড়ে রইল দিনরাত, যত দোষ হল তার। যাওয়া আসা কাজ-কর্ম সব বন্ধ। বাবুর কি মন বলে কিছু নেই। বাবুর কাছে জিতোর ব্যাপার—তাকে বিয়ে করতে চাওয়া—তার পেছু লাগা—সব কথাই বলেছে সে কিছু গোপন করেনি। রেখে ঢেকে বলেনি।

জিতো যে শয়তান—বাবুরও বোঝা উচিত ছিল। সত্যিই তো ফিল্ডের কথা বাবুর বুকের ওপর—সম্পূর্ণ মিথ্যে। বাজিয়া তাহলে কেটেই ফেলত। বাজিয়া কাজের সঙ্গে থাকে।

তবে জিতোরও এ মিথ্যে দোষ দিয়ে আক্রোশ মেটাতে যাওয়াটা খুব খারাপ হয়েছে। সাঁওলী যে বাঘিনী, একথা ভুলে গেছে। গাঁসুদ্ধ লোক সাঁওলীর নামে থরহরি কম্পমান।—জিতোকে বাগে পেলে হয় একবার।

হ্যাঁ, জিতোর আক্রোশটা আরো বেড়ে গেছে। বাড়বার কারণও

আছে যথেষ্ট! তার জন্যে দায়ী খানিকটা সাঁওলী। সাঁওলী কতকগুলো কথা ওলট-পালট করে বলেছিল—কতকটা মিথ্যে ঘটনা সাজিয়ে বুঝিয়েছিল বাজিয়াকে। বাজিয়ার খুন গরম করে দিত। জিতোর বুকে কুকরি বসিয়ে দিতে।

এসবের পরও সাঁওলী কিছুতেই মেনে নিতে রাজি নয় যে, সে দোষী আর জিতো তাকে নাস্তানাবুদ করে মেরেছে তার কুমারী জীবন থেকে।

কেনোদিনই ভালো চোখে দেখেনি ভালোবাসেনি জিতোকে সাঁওলী। সাফ-কথা বলে দিয়েছে কতবার। জিতো তবুও ছাড়বার পাত্র নয়। সাঁওলী যা কিছু বলেছে বাজিয়াকে—সবই ঠিক। কেবল জিতোর কাছে যাওয়া—আর জিতোই বাবুর কাছে যায় বলে বাজিয়ার চোখে ধোঁকা দিচ্ছে—এটা বানান কথা। এটা না বলে তার উপায় ছিল না। হিংসেয়, বাবুর তাঁবুতে হাসা-হাসির কথা রঙচঙ করে, কান কামড়ে ছিল বাজিয়ার জিতো।

—বাবুর কোনো দোষ নেই। শুনলে কি ভাববে? মনে কষ্ট করবে। এই কষ্ট থেকে রেহাই দেবার জন্যেই তার এত কাণ্ডকারখানা করা। জিতোর মুখ বন্ধ করতে বাজিয়াকে নাচান।

সত্যি কথা বলতে কি, বাবুকে সে ভালোবেসেছে মন-প্রাণ দিয়ে। বাঘের মুখ থেকে—তাকে বাঁচাবার পর থেকে। বাবু বোঝেনা তার ভালোবাসা! আরো বুঝতে দেয় না রিনিমা। দিনরাত আগলে আগলে রেখেছে। রিনিমা মরে গেলে বাবু নিশ্চয় তার ভালোবাসা বুঝত, কিন্তু তা হল না। সাঁওলীর বুক ভাঙা নিঃশ্বাস ঝরে পড়ে।

জিতোকে জব্দ করবার জন্যে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল একবার। তোমকা বাজারে হাটবারে—রোববার, মোরগের লড়াই হচ্ছে। বাজিয়া—জিতোও সেখানে দাঁড়িয়ে দেখছে। দু'পক্ষের দু'টি মোরগ। দুটি মোরগের পায়েই শানান ছোট ছোট ছুরি বেঁধে দেওয়া আছে।

লোকে লোকারণ্য। ভিড় ঠেলে ঢোকবার সাধ্যি নেই কারো।

জমাট মানুষের গোলাকার দেয়াল।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে চিৎকার করে বলে উঠল বাজিয়া, পুবদিকের মোরগের ওপব বাজি ফেলছি। ও যদি জেতে, তাহলে জিতোর কাছে হার মানবে সে, সাঁওলীকে দেবে জিতোকে—যদি মরদের বাচ্চা হয়, তাহলে সেও পশ্চিমের মোরগ ধরে বাজি ফেলুন কিছু।

ভিড়ের চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে আর একবার বলেছিল বাজিয়া—ভাই সব, শোন। এটা ভাগ্য পরীক্ষা স্রেফ—দুটি মোরগই লড়াইপটু আর তাগড়া।

জিতোও বাজিয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। পশ্চিমের মোরগের পক্ষ হয়ে বাজি রেখেছিল—এ মোরগ যদি হারে—জিতো নাকখত দেবে সবার সামনে, বাজিয়া-সাঁওলীর পায়ে ধরবে। ওদের দুজনের দশলাথি খাবে।

অগুনতি লোক লাল ঝুঁটি উঁচু করা মোরগের লড়াই দেখছে শ্বাসরুদ্ধ করে—টুঁশব্দ নেই। যখন বাজিয়ার পক্ষের মোরগ হারব হারব হয়ে আসছে—সাওলীর বুক ঢিব ঢিব করে উঠছে—একি বাজিয়া করল।

নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনল। যাই করুক বাজিয়া তারও নিজের স্বাধীন মতো আছে। জিতোকে প্রথমে তো সে নিজে হাতে খুন করবে—তারপর যা হয় হবে।—কোমরে বাঁধা কুকরিটায় হাত বুলিয়ে নিচ্ছে একবার করে সাঁওলী।

আবার যখন জিতোর পক্ষের মোরগটির হারবার উপক্রম হচ্ছে। জিতোর মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। এদিকে বাজিয়া সাঁওলী হাততালি দিয়ে জোড়াপায়ে একফুট নাগাদ লাফিয়ে উঠছে ফুর্তিতে।

উৎকণ্ঠা আনন্দ-ভরা লড়াই চলল আধঘণ্টা ধরে। তারপর সে লড়াইয়ের যবনিকা পড়ল আকস্মিকভাবে—বাজিয়ার মোরগ পায়ে বাঁধা ছুরিটি সজোরে জিতোর পক্ষের মোরগের বুকে পেটে চেপে বসিয়ে দিলে। মোরগটি ডানা ঝটপট করতে লাগল। অন্তর্ভেদী আর্তনাদ করে উঠল।

জিতো দৌড়ে পালাচ্ছিল! ভিড়ের কজন লোক দেখতে পেয়ে, টানতে টানতে ধরে নিয়ে এল ওকে। অত লোকের সামনে সাঁওলী জিতোর ছাতিতে লাথি মেরেছিল—গুনে গুনে এক, দুই, তিন—। লজ্জায় মাথা তুলতে পারেনি আর জিতো।

জিতোর সেই রাগ, সেই আক্রোশ-প্রতিহিংসার এই ভাবে শোধ নেবে, বুঝতে পারেনি সাঁওলী।

সাঁওলী পেড়াপীড়ি করে বাজিয়াকে, তুই খোঁজটা নিয়ে আয় না!

বাজিয়া বলে—বাবু যখন বলেছে, দরকার পড়লে খবর দেবে—আমি যেতে পারব না। শরম আসে।

সাঁওলী তার বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কনুইটার ওপরে চেপে ধরে। মুখে ব্যথা ছেয়ে যায়। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আর ভাবে বাজিয়া—বাবুকে বলে, হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে, সাঁওলীর হাতটা একবার দেখিয়ে নিতে হবে। ও বড্ড যন্ত্রণা পায় বোধ হয়। কিছু বলে না।

সেদিন সকালে খবর এল, বাজিয়া যেন আসে তাঁবুতে! কৃষ্ণেশ খবর পাঠিয়েছে কাজ আরম্ভ হবে আবার। সাঁওলীর জায়গায় যে ছোকরাটা কাজ করত, তাকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হুকুম করেছে বাবু—কথাটা খুব দুঃখের সঙ্গেই জানাল সাঁওলীকে বাজিয়া। সাঁওলীকে কাজে যেতে বারণ করেছে বাবু। সাঁওলীর চোখের কোণে জলের ফোঁটা টলটল করে উঠল।

বাজিয়া বলল—রিনিমা যাচ্ছে বলে হয়ত এই কড়াকড়ি। রিনিমা তো আর রোজ যাচ্ছে না! চোখ দুটো বড় বড় করে হাতের পেশী ফুলিয়ে বললে বাজিয়া—এবারে আর কোনো কথা নয়। আগের চালটা ভুল হয়ে গেছে—ছেড়ে দেওয়াটা জিতোকে। ও বেঁচে থাকলেই —এবারে দেখা হলে ব্যাটার নির্ঘাৎ মৃত্যু।

বাজিয়ার এসব হম্বিতম্বি গজরানি আস্ফালন কিছুই ভালো লাগছে না সাঁওলীর। বাজিয়ার অর্ধেক তার কানে ঢুকছে অর্ধেক ঢুকছে না।

যে কথা ঢুকছে তার তাৎপর্য কি, তাও সাঁওলী অনুভব করতে পারছে না। বুঝতে পারছে না। সাঁওলীর চোখে সব ধোঁয়াটে।

ভোরের নির্মেঘ লালচে আকাশও পাঁশুটে! চারদিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। তার মধ্যে বাজিয়া জিতো সব হারিয়ে যাচ্ছে, কেবল ঝোড়ো হাওয়ায় নিবু নিবু কাঁপা প্রদীপ আলোর মতো ভেসে উঠছে—কৃষ্ণেশের মুখ, মাথা, দেহ, সর্বাঙ্গ। কালো কুচকুচে টানা জোড়া ভুরু কোঁকড়ান চুলে ভরা মাথা। টিকলো নাক। ধনুক বাঁকা ঠোঁট। জ্বলজ্বলে ফালাফালা চোখ। টকটকে ফরসা রঙ। পা থেকে মাথা অবধি বিধাতার গড়া নিখুঁত শরীর।

সাঁওলী হতাশার নিঃশ্বাস ফেললে।—বাবুর তাকে ভালো লাগবে কেন? পছন্দ হবে কেন? রিনিমাও যখন বাবুর কাছে ছাড়া কিছু নয়, তখন তার তো কথা নেই। ক্রোমাইট ফিল্ডে কাজ করতে করতে একদিন বাবু তাকে বলেছিল—সাঁওলী, তোকে ভারি ভালো দেখায়—তুই যখন গাঁইতি হাতে—শাবল হাতে পাহাড়-মাটি-খোঁড়ার কাজ করিস।

সাঁওলীর ভুরু দুটো নেচে উঠেছিল। বাবুর মোহময় চোখের দিকে চেয়েই সে কেমন হয়ে গেছল মনে হয়েছিল, একটা অপূর্ব-অজানা সুখের ছোঁয়া বাবুর চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে তার মনের আঙিনায়। সেদিনকার সে সুখের-স্পর্শ পাগল করে তুলেছিল সাঁওলীকে! সাঁওলীর চঞ্চলমন-দুরন্তমন দৌড়ে গিয়ে বাবুকে জাপটে ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু সাঁওলীর সে আশা আজও পূর্ণ হয় নি। যখুনি এই রকম ভাব তার এসেছে—একটা না একটা বখেড়াও এসে হাজির হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে—নয় বাজিয়া, নয় রিনিমা, নয় অন্য কেউ!

কতবার বাবুকে বলেছে সাঁওলী—বাবু! আমরা কালো—নিকষ কালো, তার ওপর অসভ্য—অবিশ্যি একথা অনেকেই বলেছে—তুমি ছাড়া—এর আগে অন্য যারা এসেছিল—তারা।

আমরা হাঁটুর ওপর কাপড় পরি। আঁচলটা বুকে এক ফেরতা

দিয়ে ঘুরিয়ে কোমরে জড়াই—এসব নাকি সভ্য-সমাজে চলে না। এত এক রকম উলঙ্গ বললেই চলে। আর আমাদের ছেলেরা তো একেবারেই ন্যাংটা। সমস্ত শরীরই খোলা। কেবল একটা কাছিয়া পরে। এটা না থাকলে দেখুনেদের নাকি লজ্জায় মাথা কাটা যেত!

হেসে বলেছিল বাবু—তোদের সম্বন্ধে সেই ধারণাই ছিল আমারও আগে—এখানে আসবার আগে—তোদের সঙ্গে মেশবার আগে। আমার পূর্বের বন্ধুদের মুখে শোনা কথায়। এখন সে সব ধারণা পাল্টে গেছে একদম।

তোরা প্রকৃতির মানুষ। তোদের ঘরদোর সাজানয় যে শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়, তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। তোদের সুরুচি, সুকুমারবৃত্তি—ভদ্রতা—আতিথেয়তা সবের মধ্যে একটা আন্তরিকতার ছাপ পরিপূর্ণ। এইটাই তোদের মস্ত সম্পদ। তোদের রাগ-দ্বেষ এলে খুন করবার ইচ্ছে হলেও, সরাসরি প্রকাশ করে দেওয়া হয়। না জানিয়ে—গোপনে কোনো কাজ করা হয় না। এটা আমার বড্ড ভালো লাগে।

সাঁওলী হাসতে হাসতে কাছে এসে বলেছিল—বাবু! রঙটার ব্যাপারে—

—নিকষ কালো! আসল। ঝড়-জল-রোদে নষ্ট হবার নয়। দমফাটা হাসিতে সাঁওলীর সমস্ত দেহটা বেসামাল হয়ে পড়ছিল। হাতের শাবলটাও এধারে ঘা দিতে ওধারে ওধারে ঘা দিতে এধারে সরে যাচ্ছিল।

—ভাঙা ভাঙা কথায় সাঁওলী বলেছিল—বাবু গো! বনে শুধু হরিণ খরগোশ থাকে না-বাঘ-ভাল্লুক সাপও থাকে।

সাঁওলী সচেতন হয়ে উঠল আচমকা ট্রাকের ঘর্ঘর আওয়াজে। পাতা জড়ান সেঁকা আধপোড়া পাখির মাংসগুলো গামছায় বেঁধে নিলে। একগাল হেসে চিৎকার করে বলে উঠল—বাজিয়া, বেরিয়ে পড় শীগগির—বাবু আসছে!

সাঁওলী ছুটে বেরুতে যাচ্ছিল। বাজিয়া পথ আগলাল সামনে দাঁড়িয়ে—যাসনি সাঁওলী। বাবুর বারণ! যদি নিজে ডাকে, তখন—

সাঁওলী বসে পড়ল। সজল নয়নে মাংসের পুঁটলিটা এগিয়ে দিল বাজিয়ার দিকে! ধরা গলায় বললে, দুপুরে খাস্।

—তোরটা রাখ।

—দুটোই তুই খাস। শরীরটা ভালো নয় আমার।

বাজিয়ার বুকে হাতুড়ি পেটা যন্ত্রণা হতে লাগল—আহা! সাঁওলীটা কাজে না যেতে পেরে বড়ই মন মরা হয়ে পড়েছে!

হর্ন বেজে উঠল ট্রাকের। বাজিয়া ঝাঁপ ঠেলে বেরিয়ে এল। ট্রাকে উঠে বসল। কৃষ্ণেশের পাশে রিনি বসে। রিনির সতর্ক দৃষ্টি পাহারা দিচ্ছে কৃষ্ণেশের চোখকে—মনকে। সামনের দিকে চেয়ে, নির্বিকার চিত্তে বসে আছে কৃষ্ণেশ। ড্রাইভারকে হুকুম করল কৃষ্ণেশ—স্টার্ট।

বাজিয়ার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। বলতে চাচ্ছিল, বাবু! সাঁওলী কাজ করবার জন্যে কান্নাকাটি করছে খুব। কিন্তু বাবুর গম্ভীর মুখ দেখে, বলতে পারল না। সাহস করল না বাজিয়া।

ট্রাক ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে। বাজিয়া বলল—রিনিমা ওইটাই আমাদের কুঁড়ে!

রিনির মুখ যদিও বা ওদের কুঁড়ের দিকেই ছিল, বাজিয়ার বলাতে সে ধার থেকে ঘুরে গেল। একেবারে পশ্চিমমুখো হয়ে বসল রিনি। কোনো উত্তর দিল না। বাজিয়া বুঝল, মায়ের এখনো মনে জমা রয়েছে জিতোর কথা। নিজের অজান্তে ট্রাকের সিটের ওপর দুমদুম করে ঘুষি মারতে লাগল। যেন জিতোর হাড়পাঁজরা গুঁড়ো করে দিচ্ছে সে।

ঘুষির আওয়াজে চমকে উঠল রিনি। কৃষ্ণেশের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল—নামিয়ে দাও ট্রাক থেকে—একি পাগলামো কাণ্ড! এই সব তোমার কাজের লোক!

কৃষ্ণেশও আশ্চর্য হয়ে গেল। কোনোদিন তো এরকম খ্যাপামি ত্থাখেনি বাজিয়ার!

—এই বাজিয়া! ওকি হচ্ছে? এই—বাজিয়ার চমক ভাঙল। লজ্জায় পড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, বাবু! এমনি —এই কিছু না—গানের তাল—

রিনি কটমট করে তাকালে বাজিয়ার দিকে—রক্ষে কর মা! সাংঘাতিক তালতো—গদি চেয়ারের সঙ্গে রীতিমতো মারপিট!

রিনির বাঁ হাতে চাপ দিলে কৃষ্ণেশ। ওরা নেশাখোর! রাত্তে হাণ্ডিয়ার মাত্রা বেশি হয়ে গেছল বোধ হয়। থাক, তুমি ওসব দিকে খেয়াল কর না। এদের বহুরূপ।

ট্রাক থামল। আর রাস্তা নেই। এবড়ো খেবড়ো উঁচু নীচু রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে—বসামানুষকে তুলে ধরে নামিয়ে তুলিয়ে ঝাঁকুনি খাইয়ে এতখানি পথ এল ট্রাক। এবার চলাপথ! চলতে হবে খানিক। খানিক দূরে আকাশ ছোঁয়া পরদা টাঙান রয়েছে।

কৃষ্ণেশ বলল—ওই আমাদের ক্রোমাইট ফিল্ড—জঙ্গলের ভেতর। ওখানে শুধু সবুজের নির্যাসে ঘন-সবুজের কালচে ক্রোমাইট যে মেলে, তা নয়—ক্রোমিয়ামে লোহার ভাগ কম বেশি থাকায় এক এক জায়গায় এক এক রঙের বাদামি লালচে। ও জিনিসটা আমাদের দেশের সম্পদ। ক্রোমিয়াম ধাতুটা এখন তো লোহার পরমায়ু বৃদ্ধির কারণ—জীবনী শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যতে কত উপকারে লাগবে—তারও গবেষণা চলছে।

খুশীতে নেচে ওঠে রিনির মন প্রাণ। সামনের সবুজ তাকে ডাকছে। রিনি এগোতে থাকে। সবুজের হাতছানি তার চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে। রিনির চোখে সবুজ নেশা।

জঙ্গলের কাছ বরাবর এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কে জানে কি একটা বিচিত্র রঙের পাখি মেহগনি গাছটার মগডাল থেকে উড়ে গেল—রিনির মাথার ওপর দিয়ে। পাখিটির অদ্ভুত মিষ্টি ডাক,

যেন বাঁশি বাজছে। অন্য বাঁশি নয়। বাঁশের বাঁশির চড়া সুরের গলা পাখিটির।

রিনি গুন গুন করে গাইতে লাগল। কৃষ্ণেশ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে—সে খেয়াল তার নেই। সেও যেন বনের পাখি। মুক্ত। নীল আকাশের নিচে উড়ছে। আনন্দের বাতাসে নেচে নেচে দুলে দুলে বেড়াচ্ছে। রিনি গলা ছেড়ে গাইছে—

—ওগো প্রিয় সুন্দর
ভুলোনা আমায়,
আমারে এনেছি ওগো
মেলাতে তোমায়।

গান শেষ হল। রিনি তখনো দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণেশের মনে পাথর-চাপার ভারটা নেমে গেল। রিনি—এই রিনিকে নিজে ভালোবেসে পছন্দ করে, বিয়ে করে ছিল কৃষ্ণেশ। বিয়ের আগে একদিন দু'দিন নয়—একেবারে সাতশ তিরিশ দিন—মোদ্দা কথা পাকা দু'বছর ধরে মেলা-মেশা করেছে দু'জনে।

দু'জনের একজনের চোখেও কারো কোনো ত্রুটি ধরা পড়েনি একদিনও। বিয়ের আগে বাইরের সকলেই জেনেছিল, তারা স্বামী-স্ত্রী। কৃষ্ণেশের বন্ধুরা ঠাট্টা করতো, বিয়ে হল—তাও লুকিয়ে রাখলি—জানতে দিলি নি। ছ্যাঃ! তোর মত হাড়কৃপণ আর দ্বিতীয়টি মেলে না।

কৃষ্ণেশের বন্ধুদের এই সব মান-অভিমানে তৃপ্তি পেত খুব। বলতে ইচ্ছে করতো ওর—ওরে বোকারা! কৃষ্ণেশ হাড়-কৃপণ নয় —খাওয়াবার ভয়ে কিছু লুকোয় নি—সত্যি বিয়ে হয়নি। নিমক-হারামরা! তোদের কি কোনো দিন খাওয়াই নি এমনি? এক এক জনকে যে কতবার করে, পাঁচটাকা-ছ'টাকার ডিশ খাইয়েছি। তার বেশি তো রাক্ষসদের পেটে ধরেও না আর! বিয়েতে ফাঁকি দেবার কি আছে! তোদের খাওয়াবার মতো ট্যাঁকের জোর আছে আমার!

কিন্তু এসব বলতে গিয়ে মুখ চেপে ধরত মনের তৃপ্তি—বিয়ে

হয়ে গেছে কথাটা তার এত ভালো লাগত যে, এই নিয়ে বাদ-প্রতিবাদে মত্ত হতে ইচ্ছে করত না মোটে।

বিয়ের আগে—বিয়ের আগেই আগেই বা বলি কেন—পরেও তো—এখানে আসবার কিছুদিন আগে অবধি—রিনি তার কাছে—তার চোখে সৌন্দর্যের রানী, ভাবময়ী-জ্ঞানময়ী ছিল।

আজ কৃষ্ণেশের কত আনন্দ। ভাবময়ী রিনিকে সে আবার দেখতে পেয়েছে। এত শীগগির এ-রূপ দেখতে পাবে, এটা কল্পনার বাইরে ছিল কৃষ্ণেশের। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!

কৃষ্ণেশ আস্তে আস্তে রিনির পিঠে আঙুল ছোঁয়াল। মৃদুস্বরে ডাকল—রিনি! রিনু!

রিনি তার বহু পরিচিতের স্নেহ মাখান ডাক শুনল। এ ডাক তার হৃদয় জয় করা ডাক। পলকে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সেই কৃষ্ণেশ মুখার্জী—নার্সিং হোম—হারিয়ে যাওয়ার ডাক ফিরে এসেছে আবার। সাড়া দিতে ইচ্ছে করছে না রিনির। সাড়া দিলেই থেমে যাবেই। আর একটু শুনুক সে।

—রিনু! কি ভাবছ এত? রিনি চুপ করে থাকতে পারল না আর। চুপ করে থাকাব বাঁধন ভেঙে ফেলল—মুখার্জী ব্যথা পাবে, অস্থির হয়ে পড়বে। আর নয়। রিনি সাড়া দিল—ভাবছে, জঙ্গলের ছবি কত সুন্দর। মুখার্জীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

—কি দেখছ? কিছু কি বলতে চাও?

কি বলবে রিনি? কোনো ভাষা আসছে না জিভের আগায়। সে কি দেখছে মুখার্জীকে? সে দেখছে, কত সুন্দর মুখার্জী। মুখার্জীর মতো ত্রিভুনে আর কেউ নেই। মুখার্জীর অন্তর বার সুন্দরে ছেয়ে গেছে। মুখার্জী সুন্দরময়।

হরিণগুলো ছুটো-ছুটি করতে করতে জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। চক্ষের নিমেষে যে পথ দিয়ে এসেছিল ওরা—সেই পথ ধরেই আবার তীরবেগে দৌড়ল উল্টো দিকে।

বাজিয়ার হাত নিশপিশ করে উঠল। ছুঁড়লে তীর। অব্যর্থ লক্ষ্য। বাজিয়ার তীর গিয়ে বিঁধল সবশেষের হরিণটির পেটে। আছড়ে পড়ল হরিণটি। রিনির স্বপ্নভঙ্গ হল। কৃষ্ণেশের ধ্যান। হরিণটির কাছে ছুটে গেল ওরা দুজনে—রিনি কৃষ্ণেশ। বাজিয়াও।

হরিণটির চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। তখনো ছটফট করছে। ওর মায়াবী ভীরু চোখ দুটো একভাবে তাকিয়ে আছে রিনির দিকে। কাতর চাউনিতে রিনির চোখ ফেটে জল ঝরছে। হরিণটির মাথা তুলে নিল কোলের ওপর রিনি।

—মুখার্জী, একটু জল !

কৃষ্ণেশ বাজিয়াকে বলল। বাজিয়ার প্রাণে খুব ফুর্তি। সে শিকার করেছে কাজ আরম্ভ করবার সময়। দিনটা ভালো যাবেই। শিকার তাদের খাবার। এতে রিনিমার এত কাঁদাকাঁদির কি আছে ? ও তো এখুনিই শেষ হয়ে যাবে জল আনতে আনতে। মিছি মিছি যাওয়া। যাওয়া-আসা সার হবে। বাবুর হুকুম যখন, যেতেই হবে। বাজিয়া চলে গেল।

জল আসবার আগেই হরিণ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলে, মাথা গড়িয়ে পড়ে গেল রিনির কোল থেকে। রিনির চোখের জল অঝোরে ঝরতে লাগল। কৃষ্ণেশের চোখেও জল।

রিনিকে হাত ধরে খুলল কৃষ্ণেশ।

পরিবেশ সম্পূর্ণ বদলে গেল। মধুর ভাবটা ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। রিনির মন বিষিয়ে উঠল বাজির ওপর।

—লোকটা সাংঘাতিক ! ট্রাক থেকেই কি রকম কি রকম ঠেকছিল ওকে। প্রাণে দয়ামায়া নেই একটুও। সুন্দরকে যে নিষ্ঠুর ভাবে—মুখার্জী ! আমার ভালো লাগছে না ওদের। ওদের ছাড়া কি তোমার কাজ হয় না অন্য কাউকে দিয়ে ?

—না রিনি। ওরাই এসব কাজ করে। কাজের সময় সেন্টিমেণ্ট নিয়ে থাকলে চলে না।

—সেন্টিমেণ্ট ! রিনির মনের পরদা কেঁপে উঠল। এত চেষ্টা,

করেও সে পরদার কাঁপুনি থামাতে পারছে না। সেখানে ঝড় বয়ে চলেছে। একটা নির্দয় ঝড় অনবরত ধাক্কা মারছে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে বলে। রিনির চোখে মুখে ভয়। একটা ভয়ঙ্কর ছবি দেখছে যেন সে। অস্থির হয়ে পড়ে। ভীতি-বিহ্বল চোখ দুটো তুলে ধরল কৃষ্ণেশের মুখের ওপর।

—মুখার্জী! আজ আমার কিছু ভালো লাগছে না। ফিরে চল!

—রিনি! স্থির হও! আমি জানি তোমার নরম মনের জন্যে এ জায়গা নয়। আনতে চাইনি। তুমি জিদ করে এলে। যে জন্যে তুমি এত অস্থির হয়ে পড়ছ—এটা এখানকার আকছার ব্যাপার—নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। তুমি ওধারে একটু বসবে চল—কাজটা সেরেই ফিরব। বাজিয়া জল নিয়ে এল। জলের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কৃষ্ণেশ হরিণটির কাছে ঢেলে দিতে ইঙ্গিত করল। বাজিয়ার হাসি আর ধরে না।

—নাদুস নুদুস শরীরটা বেশ! তিনচার দিনের খোরাক হবে'খন। ঠোঁটের পেছন অবধি কথাগুলো এসেই থমকে গেল! বেরুল না। কৃষ্ণেশের চাউনিতে রক্তরাঙা নিষেধ—খবরদার, রিনিমার সামনে—

মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল বাজিয়ার। ঘাড় নীচু করে, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে—যা হবার তাই হল। কৃষ্ণেশ যা ভয় করেছিল সেই কাণ্ডই ঘটে গেল নিমেষের মধ্যে। কৃষ্ণেশের চোখের শাসনে পড়বার আগে বাজিয়ার ফুর্তি ওথলান হাসি নজর এড়ায় নি রিনির। ভীতি-বিহ্বল চোখ দেখেছিল। ভীতি পালিয়ে গেছল চোখ থেকে—তার জায়গায় বিরক্তি ঘৃণা রাগের তীব্র আগুন জ্বলে উঠল। সে আগুনের তাপ কৃষ্ণেশের মুখ চোখ বাজিয়ার মুখ চোখ ঝলসে দিতে লাগল। রিনির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওদের অসহ্য হয়ে পড়ল।

রিনি মুখ খুলল—মুখার্জী, এখুনি ফিরে যেতে হবে তাঁবুতে! দৃঢ়কণ্ঠ রিনির ইস্পাত বাঁকান কথা।

বাজিয়ার দিকে ফিরে বলল, এরা সব পারে। বেমালুম হাসতে হাসতে খুন করতে পারে—তুমি এ সঙ্গ ছাড়। একাজ ছাড়!

কৃষ্ণেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল—বাজিয়া কি ভাববে?

রিনিকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বাজিয়া সম্বন্ধে—আদিবাসীদের সম্বন্ধে বোঝাল কৃষ্ণেশ। হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়, ওদের পেটের জন্যে—তাই হিংস্র হয়ে ওঠে ওরা। এও বোঝাল, আর কটা দিন তো বৈ নয়! একটু সবুর কর!

কটা দিন শুনে রিনি আশ্বস্ত হল খানিক। তবু একটা শর্ত করিয়ে নিল কৃষ্ণেশকে দিয়ে, যে কটা দিন থাকা হয় এখানে, সে কটা দিন রিনিকে রোজ আনতে হবে এখানে। এই ভয়াবহ জঙ্গলে—আশপাশের হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে গিয়ে আর ওদের সমভাবী মানুষদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে, একলা ছেড়ে দিতে পারে না রিনি। সারা দিন তাঁবুতে দুর্ভাবনার নিদারুণ যন্ত্রণা নিয়ে থাকতে পারবে না সে।

রিনিকে শান্ত করবার জন্যে অন্যমনস্ক করবার জন্যে, রাজি হল কৃষ্ণেশ।

সাঁওলীর জায়গায় যে ছেলেটি কাজ করবে—সেও এসে হাজির। ছেলেটির নাম পরজি। পরজি বাজিয়ার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বাবুর হুকুম পেলে কাজ আরম্ভ হবে।

বাজিয়া নিম গাছটার গুঁড়ির সঙ্গে হরিণটিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দিল। ফেরার সময় নিয়ে যাবে। পরজি-বাজিয়া দুজনে যে যার গাঁইতি-শাবল-হাতুড়ি নিয়ে তৈরি হল কাজ করবার জন্য।

ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকল কৃষ্ণেশ। ওরা কৃষ্ণেশকে অনুসরণ করে চলতে লাগল। সামনে কৃষ্ণেশ চলছে, রিনি পাশে। পেছনে পরজি-বাজিয়া।

বাঁদিকে কতকগুলো শাল অশ্বত্থের ঘন সারির পাশ দিয়ে, নিশান পোঁতা জায়গাটা খোঁড়া হবে। হ্যাজাক লাইট জ্বেলে কাজ শুরু হল। অবিশ্যি অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর ওদের টর্চের আলো

জেলে ঢুকতে হয়েছে যদিও, কিন্তু সে আলোয় কাজ করা অসম্ভব।

রিনি যেন পাতালপুরীর ভেতর বসে আছে। একটা গুমোট ভাব ভেতরটায়। চার ধারে জীবন্ত গাছের বেড়া—ছাউনি পর্যন্ত গাছের গুহা। দম আটকান আবহাওয়া।

গাছের গুহার মধ্যে বসে বসে দেখছে রিনি, বাজিয়ার শাবলের ঘায়ে পাথর-মাটির বুক থেকে আগুন ছিটকে বেরুতে লাগল টং টং আওয়াজের সঙ্গে। পরজি তো তার বলিষ্ঠ দেহটাকে নুইয়ে দিচ্ছে—টেনে তুলছে শাবলের মাথায় হাতুড়ির ঘা বসাবার সময়। উল্লাসে চিৎকার করে বলে উঠল বাজিয়া—বাবু, পাওয়া গেছে!

রিনির কাছ থেকে উঠে গিয়ে বাদামি চাপড়া নিয়ে এল কৃষ্ণেশ। রিনিকে দেখিয়ে বলল, রিনি এদের কম ঐশ্বর্য নয়—কি ভাবে কোথায় আত্মগোগন করে আছে ছাখ! হ্যাজাকের আলোয় চকচক করে উঠেছে বাদামি ক্রোমাইট।

রিনি দেখছে আর ভাবছে, আগুনের তলায় ফাগুনের বসন্ত লুকনো এ যে! অপূর্ব আনন্দের অনুভূতি বাইরের ছুনিয়া থেকে, বিচ্ছিন্ন করে দিল রিনিকে।

কৃষ্ণেশেরও চোখ ছুটো অন্ধকারে জ্বল জ্বল করছে। খুশীর মানিক আভা মারছে। কৃষ্ণেশ গরগর করে বলে যেতে লাগল—পৃথিবী যখন অগ্নিকুণ্ড, যখন তার তরল অবস্থা প্রায়, তখনও এই ক্রোমাইট ছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবী হিম শীতল হয়ে আসতে লাগল—জমে গেল সব। মাটি পাথর ধাতুতে রূপ পেল, সব একাকার হয়ে। সেই একাকারের এটি একটি অংশ। পৃথিবীর বুকের হাড়। পৃথিবী দধীচি।

রিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। ফেরবার কথা ভুলে যায়। কাজ চলল খানিকক্ষণ এধার ওধার। আরো যেখানে যেখানে সাদা নিশান পোঁতা। অন্ধকারে সাদা তবু চোখে লাগবে। তাই লালের বদলে নীলের অন্য রঙের বদলে সাদাটাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে এই অন্ধকুপের জন্যে। তবুও সাদা চাপা পড়ে যায়

কালোর দাপটে। এই রাক্ষুসে কালোর সঙ্গে যুদ্ধ করে তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সঙ্গে রীতিমতো বোঝাবুঝি করে কালোর কবল থেকে ভালোকে উদ্ধার করছে মানুষ—তার বিজ্ঞান শক্তি।

কথাগুলো দর্শন-ঘেঁষা বক্তৃতাধর্মী হলেও খুব নীরস শোনাল না রিনির কানে। বরং খুব মিষ্টিই লাগল।

কাজ শেষ হল আজকের মতো—বাজিয়া পরজিকে হুকুম দিলে কৃষ্ণেশ। ট্রাকে স্যাম্পল রেখে দিতে বলে দিল।

বাজিয়া নিজেই বলল—বাবু, আমরা হেঁটে যাব। ইশারায় দেখিয়ে দিল নিমগাছটিকে—ঘাড় নেতান হরিণটিকে। রিনির দিকেও ভয়ে ভয়ে চাইল একবার। ঘাড় নাড়ল কৃষ্ণেশ—সম্মতি জানাল।

ওরা আগে চলে গেল দ্রুত পায়ে—রিনির চোখের আড়ালে সব কাজ সারতে হবে। হরিণকে এখান থেকে সরাতে হবে।

রিনিকে আস্তে আস্তে ডাকলে কৃষ্ণেশ—রিনু! উঠবে না? ফিরতে হবে যে!

রিনির চমক ভাঙল। কাজ হয়ে গেছে? এত শীগগির! ভাবতেও পারেনি। রিস্টওয়াচের দিকে চোখ নামাল—ও মাই গড্। তু'ঘণ্টা! কোথা দিয়ে কেটে গেল যে বুঝতে পারলুম না। মনে হচ্ছে—এই তো এলুম! রিনি খুশীতে ডগমগ হয়ে চলছে। কৃষ্ণেশের দেখেও আনন্দ। তুজনেই হাত ধরাধরি করে এসে উঠল ট্রাকে। ভীষণ গর্জন করে বনভূমির ঘুম ভাঙিয়ে জন্তু-জানোয়ারদের বুক কাঁপিয়ে ছুটল ট্রাক।

সাঁওলীদের ডেরার কাছ বরাবর সচেতন হয়ে উঠল রিনি। চেয়ে দেখে সাঁওলী দাঁড়িয়ে ঝাপের আড়ালে। রিনি চিৎকার করে বলে উঠল, ড্রাইভার, গাড়ি ঘোরাও এক্ষুণি! অন্য রাস্তা—অন্য রাস্তা ধর—দেরি কর না! অবাক হয়ে গেল কৃষ্ণেশ।—কি ব্যাপার! হঠাৎ—ওরও নজরে পড়ল সাঁওলীকে। নামার ইচ্ছে হল। গাড়ি রুখবার ইচ্ছে হল। কিন্তু রিনির মুখ চেয়ে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে

মুখ ফেরাতে হল অন্য দিকে।

ড্রাইভার বললে—মা, এখন অন্য রাস্তা নেই আর এ রাস্তা ছাড়া!

হতাশায় ভাঙা স্বরে বললে রিনি—তবে স্পিড বাড়াও! যত বাড়ে!

—অ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে যাবে। রাস্তা ভালো নয়।

—হুক?

ড্রাইভার বিস্মিত হয়ে রিনির মুখের দিকে একবার, কৃষ্ণেশের মুখের দিকে একবার চাইল। কৃষ্ণেশ চোখের ভাষায় ঘাড় নেড়ে জানাল, ঠিক আছে। যেমন চালাচ্ছ তেমনি চালাও!

সাঁওলীর চোখের সামনে দিয়ে কৃষ্ণেশের ট্রাক বেরিয়ে গেল। সাঁওলীর হৃৎপিণ্ড নিংড়ে সমস্ত রক্ত নিঃশেষ করে দিয়ে গেল যেন। সাঁওলী দাঁড়াতে পারল না। পা দুটো তার অবশ হয়ে আসতে লাগল। লুটিয়ে পড়ল ঝাঁপের ধারে। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

—বাবু ফিরেও চাইল না একবার! বাজিয়াকেও সঙ্গে নেয়নি। এরকম তো আজ পর্যন্ত হয় নি কোনোদিন! যত নষ্টের মূল ওই জিতোটা। প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে সাঁওলীর মাথায় বুকে। সে আগুনের তাপে চোখের জল শুকিয়ে যায় নিমেষে। সাঁওলীর লুটিয়ে পড়া দেহ খাড়া হয়ে ওঠে।

বাজিয়া এল।

সাঁওলীকে তার শিকার দেখাল—মরা হরিণটির পেটে লাল রক্ত জমাট বেঁধে কালচে হয়ে গেছে। অন্যবারের মতো সাঁওলী কোনো আগ্রহ প্রকাশ করল না। আনন্দে নেচে উঠল না। গেয়ে উঠল না—'আজ বনতে শুলে, বুনতে বনুয়া শবর'···গলা জড়িয়ে বলল নাঃ বইতাবর, তুই আমার যোয়ান মরদ। কত হিম্মত তোর। বনেত রাজারানী আমরা দুজনে।

সাঁওলীর নিস্পৃহভাবে বাজিয়া মুষড়ে পড়ল। ফিল্ডে যাওয়ার সময় থেকেই তার মনটা আজ ভেঙেছে—সাঁওলীর না যাওয়া—যাবার সময় মুখের আহার হাতে তুলে দেওয়া—রিনিমার মুখ ঘোরান—

হরিণ মারায় যা তা শোনা। ডেরায় ফিরে আবার সাঁওলীর মুখভার দেখে, এক এক করে আত্মসম্মানে আঘাত লাগা জমাক্ষোভ ফেটে পড়ল বাজিয়ার। বাজিয়ার রাগ সপ্তমে চড়ে গেল। অকারণ গুম করে সাঁওলীর পিঠেই এক ঘুষি বসিয়ে দিল তার সারাদিনের জ্বলুনিকে ঠাণ্ডা করতে। সাঁওলী ককিয়ে উঠল। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করল না। আগেকার মতো গর্জে উঠে টাঙি নিয়ে, কুকরি নিয়ে, তেড়ে এল না বাজিয়ার দিকে। চুপ করে বসে রইল। তার জন্মগত স্বভাবের বিরুদ্ধে গেল সে এই প্রথম।

বাজিয়ার সারাদিনের দুঃখু-বেদনা-ক্ষোভ মুহূর্ত মধ্যে স্তিমিত হয়ে গেল সাঁওলীর নির্বিকার ভাবে। হতভম্ব হয়ে গেল বাজিয়া—সাঁওলীর এ ভাবের সঙ্গে সে কখনো পরিচিত নয় নতুন আগন্তুককে তার মন মেনে নিতে পারলেন না। একটুও ভালো লাগল না। এ যেন মরা সাঁওলী। সামনে পড়ে থাকা মরা হরিণের মতো। অসহ্য অসোয়াস্তি হতে লাগল বাজিয়ার। মনে হল বাইরে বেরিয়ে যায় ছুটে। ডাক ছেড়ে কাঁদে। একি হল তার! যে সাঁওলীর জন্যে গ্রামসুদ্ধ লোকের সঙ্গে শত্রুতা করতেও পেছপা হয় নি। সাঁওলীকে নিয়ে কত দাঙ্গা-হাঙ্গামা। জিতোর দল তার পেছনে সদাসর্বদা লোক লাগিয়ে রাখত—জিতোর পরোয়ানা ছিল ওদের ওপর—বাজিয়ার মাথা যে কোনো প্রকারে আনতেই হবে।

সাঁওলীকে নিয়ে এই কাড়াকাড়িতে একাই একশ হয়ে লড়েছিল বাজিয়া। বাজিয়া জানের পরোয়া করে নি। পরোয়া করতে শেখেনি কোনোদিন। ওদের দলের সকলকেই এক এক করে মাথা নোয়াতে হয়েছে—বাজিয়ার শক্তির কাছে। যারা ছিল জিতোর দলে, তারাও চলে এল পরে বাজিয়ার দলে।

সাঁওলীর পর্ব নিয়ে যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ চলেছিল—অবিশ্যি সাঁওলীরও তাতে সম্পূর্ণ সহায়তা ছিল—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সাঁওলীও অনেক সময় বাজিয়াকে পেছনে রেখে, এগিয়ে গেছে—শত্রুপক্ষের সামনে। নিজে অস্ত্র ধরেছে। সাঁওলীর এই দুঃসাহসই

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে অনেক দিন বাজিয়াকে। সে ঘটনা আজও বাজিয়ার চোখের সামনে জলজ্বল করে ভেসে ওঠে। সে ঘটনা ভোলবার নয় জীবনে। কখনো ভুলতে পারে না বাজিয়া।

বাজিয়া সাঁওলীর একগুঁয়েমি দুরন্তপনাটাকেই বেশি ভালো বাসত। ওর অবাধ্য-বেপরোয়া ভাবটাই তার মন কেড়ে নিয়েছিল। ওর গরম রক্তের স্রোত—আর নাচুনি, বাজিয়াকে দুর্দান্ত করে তুলত। তার মাথার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠত। সর্বশরীর স্টিলের পাতের মতো শক্ত হয়ে উঠত। দু'তিনশ লোকের মহড়া একলাই নিতে পারত।

সাঁওলী-বাজিয়ার শক্তি। সাঁওলীর সঙ্গে বাজিয়ারও কথায় কথায় মারপিট হয়েছে কত! তাতে দু'জনেরই প্রেম জমে উঠেছে আরো!

সাঁওলী এসে মারুক বাজিয়াকে কুকরি দিয়ে তার বুকটা চিরে ফালা ফালা করে দেখুক—কি যন্ত্রণা বিঁধছে সেখানে। এরকম চুপ করে থাকার চেয়ে—ও তাই করুক।

বাজিয়া কুকরিটা সাঁওলীর হাতে গুঁজে দিল—নে! ধর! বুক পেতে দিচ্ছি, মার! মার বলছি। হাত দুটো ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল।

সাঁওলীর স্থির দৃষ্টি অস্থির হয়ে উঠল। চনমন করে চারিদিকে চেয়ে নিলে একবার। কুকরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে ঘরের কোণে। বাজিয়ার চোখে তারার ব্যাকুল ঢেউয়ে ডুবে গেল সাঁওলী। ঝাঁপিয়ে পড়ল বাজিয়ার বুকের ওপর।

অস্তর ছেঁচা কাতরস্বরে বলল, বাজিয়ারে—আমায় ছাড়িসনে!

বাজিয়া হতবাক—'ধরে রাখিসনে, ছেড়ে দে না'—এই কথাই সাঁওলীর মুখ থেকে শুনে তার কান অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এই 'ছাড়িসনে' বার বার দু'বার কথাটা শুনল। কানে নিষ্প্রাণ হয়ে বাজল। বাজিয়া ক্রমে নিরাশায় ভেঙে পড়তে লাগল। জোর করে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। জিতোর চেহারাটা তার চোখের

সামনে ভেসে উঠল। নামটা জিভের আগায় এগিয়ে এল। বাজিয়া ঠেলে ফেলে দিল সাঁওলীকে।

সাঁওলী, তুই বুঝতে পারছিসনা! জিতো-অজগর আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ওকে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটতে হবে। জঙ্গলের অজগরের মুখে সেই টুকরোগুলো ফেলে দিতে পারল তবে শান্তি—তবে নিশ্চিন্ত। গতবারে শেষ করতে করতে ছেড়ে দিয়েছি, এবারে আর নয়। বড় বাড় বাড়িয়েছে। তোর আমার বাবুর রিনিমার সবার সুখের কাঁটা নয়, বিষাক্ত কাঁটা—যত শীগগির পারা যায় তুলে ফেলতে হবে।

সাঁওলীর চোখ দুটোয় কেউটের ফণা নেচে উঠল। জিতো! ঠিক বলেছে বাজিয়া। ঘরের কোণে পড়ে থাকা ভোজালিটা তুলে নিল। সজোরে মরা হরিণটির তীর বেঁধা জায়গায় বসিয়ে দিলে। বাজিয়া শিকার-উল্লাসে হো হো করে হেসে উঠলো। সাঁওলীকে বুকে আঁকড়ে ধরল। বাজিয়ার হাসিতে সাঁওলীও গলা মেলাল। ঘরের মধ্যে প্রেত জগতের তাণ্ডব আবহাওয়ায় ভরে গেল। এখুনি যেন ওরা দুজনে জিতোর বুকে ভোজালি মেরে শেষ করে ফেলেছে।

তাঁবুর সামনে ট্রাক থামল।

রিনি কৃষ্ণেশ নামল। হাত ধরাধরি করে নয়। দুজনে পাশাপাশি হলেও ঘেঁষাঘেঁষি নয়। ছাড়াছাড়ি। কেমন যেন কাছাকাছি থেকেও দূরে বহু দূরে চলে গেছে দুজনে। অন্তত ওদের মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে।

খাবার সময় এক টেবিলে মুখোমুখি হয়ে বসল রিনি কৃষ্ণেশ।

রিনির মনটা ভালো নেই।—ঝাপের আড়ালে সাঁওলী বাঘিনী ওত পেতে থাকে শিকার ধরবার জন্যে। নিশ্চয় আড়চোখে দেখেছে মুখার্জী, তা না হলে এত মুখ ভার কেন? জিতোর কথাটা কি সত্যি? রিনিকে নিয়ে মুখার্জী শান্তি পায় না। সাঁওলীকে নিয়ে —মিছিমিছি—তার নিজের জন্যে মুখার্জীকে আটকান ঠিক হচ্ছে না। ওকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। তার চেয়েও ওর জ্বালা বেশি। একেবারে গুমখুনে মরা। তার চেয়ে নিজেরই চলে যাওয়াটা ভালো। সাঁওলী-মুখার্জী দুজনেই বাঁচুক।

রিনি শান্ত ভাবে বেশ মোলায়েম গলায় বলল—মুখার্জী! বাহাদুরের সঙ্গে আমায় পাঠিয়ে দাও। এখানে থাকলে মাথা ঠিক রেখে চলতে পারব না। তোমারও অশান্তি—আর সবারও। আমি রাগ-দুঃখ করে বলছি না। আমি সব বুঝেও অবুঝ হয়ে যাচ্ছি। এখানে থাকতে গেলে—কাজ করতে গেলে—এখানকার লোকের সঙ্গে সদ্ভাব না রেখে চলল সব পণ্ড। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি মুখার্জী, সাঁওলীকে দেখলে আমি যেন কি রকম হয়ে যাই। সব উল্টে পাল্টে যায়। আমার চিন্তাধারার খেই হারিয়ে যায়। সংযমের বাঁধ ভেঙে স্রোত ছুটতে থাকে—কি বলছি কি ভাবছি, কি করছি—বুঝে উঠতে পারি না। ওকে সহ্য করতে পারিনি। ওর স্বামী বাজিয়াকেও না।

রিনি! লোককে আপন করে নেওয়ার মতো শান্তি আর দুনিয়ায় নেই। যতই পর ভাববে, তত তার দোষ দেখতে পাবে, খুঁত ধরতে থাকবে। লোকের কথায় কান দিলে নিজের ইষ্ট না করে অনিষ্টকেই ডেকে আনা হয়। মন উদার করলে ছোটখাট ব্যাপার লক্ষ্য পড়ে না চোখে। লোককে ভালোবাসতে পারলে তার দোষটাও গুণ হয়ে দাঁড়ায়। নিজে মনে প্রাণে ঠিক থাকলে, ভেঙে না পড়লে, কখনো কোনো দিক দিয়েই তার বিপদ আসে না। বিপদে কেউ ফেলতে পারে না তাকে।

—মুখার্জী, কাল যাবার সময় সাঁওলীকে তুলে নোব।

মুখার্জীর মুখ চোখে খুশীর দীপ্তি ফুটে উঠল।

পরদিন।

ট্রাকের ঘর্ঘর আওয়াজে কানে আঙুল দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইল সাঁওলী। যে আওয়াজ শোনবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠত এক সময় এখন, সে আওয়াজে ক্ষেপে উঠছে সে। দরকার নেই এ বুক ফাটান আওয়াজ শুনে!

বাজিয়ারে। অন্য রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে বলিস বাবুকে! সাঁওলী ডান হাতের কনুইয়ের ওপরটা চেপে ধরল।

বাজিয়া ধরে বসল সাঁওলীকে।

আজ তোকে বলতেই হবে—ওখানটায় তোর কি হয়? বাবুকে আমি বলবই—লাজলজ্জার মাথা খেয়ে। হাসপাতাল থেকে আসবার পর এই উপসর্গ দেখছি তোর।

ট্রাক এসে পড়ল বলে। আমি এখুনি বলছি। তোকে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই হবে একবার। দেখাতে হবে। বাজিয়া বেরুতে যাচ্ছে, সাঁওলী হাত ধরে টানল ভেতর দিকে। তার চোখে শরমের নরম চাউনি।

বাবুকে বলিসনা কিছু। রিনিমা আছে যে!

তাতে কি হয়েছে?

বুঝিসনা কেন পাগলা? শোন, আমার কিছু হয় নি। ওই জায়গাটা দিয়ে অনেক রক্ত—। চোখ দু'টো ছলছলিয়ে ওঠে আবার সাঁওলীর।

রক্ত!

হ্যাঁ, মরে যেতুম হাসপাতালে বাবু রক্ত না দিলে। বাবুর ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব নারে বাজিয়া! বাবু এ কি করল রে আমার! মনের ভেতর খচখচানি থেকে রেহাই পাচ্ছিনা। গুমরে ওঠা ব্যথা ডুকরে কান্নায় সার হচ্ছে।

বাজিয়া লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল। বাবু দেবতা! সেই বাবুর ঘরে আগুন ধরিয়েছে জি—

ট্রাক এসে থামল।

হন্তদন্ত হয়ে ঝাপ ঠেলে বেরিয়ে এল বাজিয়া। পেছন দিকে এক লাফে ট্রাকে উঠে বসল।

রিনি হেসে গড়িয়ে পড়ছে বাজিয়ার বানর-লাফানোয়। হ্যাঁ, তাক আছে লোকটার!

অ্যাই বাজিয়া! সাঁওলী কই? ডেকে নিয়ে আয় শীগগির। যেমনি লাফিয়ে উঠেছিলি, তেমনি লাফিয়ে নাম!

বাজিয়া রিনির কথায় অবাকবিস্ময়ে চেয়ে থাকে কৃষ্ণেশের দিকে। এত শীগগির রিনিমার মন গলেছে? কালকের রিনিমা! নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। ঠিক শুনছে, না ভুল শুনলে? শেষে এক করতে গিয়ে আর এক কাণ্ড করে বসবে না তো—হিতে বিপরীত।

কৃষ্ণেশ বাজিয়াকে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্বাসঝরা কথায় বলল—সাঁওলীকে ডেকে নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি। কি দেখছিস ফ্যাল ফ্যাল করে? কাজে যেতে হবে না।

লাফিয়ে পড়ল বাজিয়া। পড়িমড়ি করে ছুটল ভেতরে। সাঁওলীর হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। সাঁওলী বাজিয়ার এই ব্যাপারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। কিছু জিগ্যেস করবার সুযোগ না দিয়েই সাঁওলীকে দু'হাতে তুলে ধরে ট্রাকের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিলে। যেন একটা পুঁটলিকে ফেললে সে।

সাঁওলী ভেতরে পড়েই উঠে বসল। লজ্জায় কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল—মুখ থেকে বেরিয়ে আসছিল—মুখপোড়া মিনসের ঢং দেখ না! কিন্তু রিনিমা কৃষ্ণেশের জন্যে বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকতে হল। জড়সড় হয়ে বসে রইল সাঁওলী।

রিনি সাঁওলীর হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিল—আ-মর! একটু হাসবি, কথা কইবি, তা নয়, গোমড়ামুখো হয়ে বসে আছিস কেন অমন করে! সাঁওলীর ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি উঁকি মারল। সাজান ধবধবে সাদা দাঁতগুলো আসা-যাওয়া করতে লাগল ঠোঁটের

ঝাঁকে ঝাঁকে, ট্রাক চলার ওঠা-নামায়!

রিনি বেশ সহজ হয়েই বাজিয়া-সাঁওলীকে সহজ করে নিল। ওদের সংকোচ-ভরা-অভিমানকে, গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়ে, আস্তে আস্তে সরিয়ে দিতে লাগল। সকলের ভেতরে একটা জমাটগুমোট ভাব কাটতে শুরু করে দিল। হালকা হাসির ছোঁয়াচ লেগে সকলেই হেসে কুটিকুটি। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসা—হাঁফিয়ে পড়া গোমরানি ট্রাকের ঝাঁকুনি আর হাসির নাচুনির ভয়ে পালিয়ে গেল।

গাড়িপথের শেষে ট্রাক থামিয়ে, হাঁটাপথে চলতে শুরু করে দিল রিনি-কৃষ্ণেশ-সাঁওলী-বাজিয়া। একটা বৃষ্টি-ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটে আসতে লাগল। ছুটে চলল ওদের পেছু পেছু। আকাশে টুকরো টুকরো কালো-সাদা মেঘের, খেলা চলল পরস্পরের জড়া-জড়িতে। কোথাও পাহাড়, কোথাও সমুদ্রের ঢেউ।

কৃষ্ণেশ বললে—বৃষ্টি আসবার সম্ভাবনা—কাজ—

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সাঁওলী বলল—বাবু। ভেজা অভ্যাস আমাদের আছে। আসুক না বৃষ্টি। কাজ বন্ধ যাবে না। তাছাড়া, আজ যেখানে কাজ—বৃষ্টি পড়লেও ভয় নেই।

গত কালের মতো একদল হরিণ আজো ছুটে চলে গেল জঙ্গলের এপাশ থেকে ওপাশে—ওদের সামনে দিয়ে।

বাজিয়ার নিশপিশে হাত দুটো উসখুস করে উঠল। ধনুকটায় হাত ছোঁয়াতে গিয়ে থমকে গেল। কালকের ঘটনা মনে পড়ে গেল। রিনির দিকে তাকাল বাজিয়া। রিনির করুণ চাউনি তার দিকেই। সে চাউনি আদেশ করছে না—কাতর অনুরোধ--আহা! বড্ড নিরীহ—ওকে নয়—ওকে নয়। চোখ নামাল বাজিয়া। একি শাসন রিনিমার! চোখ রাঙিয়ে আদেশ করলেই তো পারত—কাল থেকে বাজিয়ার নসিবে আগুন লেগেছে। এতদিনে বাজিয়াকে কেউ দমাতে পারেনি—পরাস্ত করতে পারেনি। এইবার বাজিয়ার মৃত্যু নিশ্চিত। সাঁওলী রিনিমার অহিংস শাসনের ঝড় বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। ওরা কেন এত নির্দয় হয়ে উঠছে বাজিয়ার ওপর।

বাজিয়া বাঘের পেশীর শক্তিকে এই ভাবে চেপে বেঁধে রাখছে। এটা বুঝছে না কেন, বাজিয়ার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেলে জিতো অজগর তার হিংসার জ্বলন্ত নিঃশ্বাসে বনভূমি পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে—সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে—এইটাই কি চায় সাঁওলী—চায় রিনিমা ?

না, না। বাজিয়া বাঘের বাচ্চা বাঘ। কিছুতেই মরবে না। জিতোকে না মেরে, সে মরতে পারে না। মরতে চায়ও না।

সাঁওলী রিনিমা তাকে সাহায্য না করুক, তার পাশে এসে না দাঁড়াক, না উৎসাহ দিক—কিচ্ছু এসে যায় না। তবে বাজিয়া কারো দমিয়ে দেওয়া, নিরুৎসাহ করা, কিছুতেই মেনে নেবে না। বাবুরও না। তাকে বাঁচতে হবে। সর্দারের ছেলের আসন রাখতে হবে। বাপ-ঠাকুর্দার ইজ্জত খোয়ালে চলবে না।

বাবা সর্দার হবার সময় বলেছিল—তাদেয় বংশের সঙ্গে জিতোদের বংশের চিরকালের ঝগড়া—সাপে-নেউলে। যদি এ বংশের কেউ কোনো মেয়েকে ভালোবেসেছে, ও বংশ জানতে পারলেই অমনি হুলস্থূল। সে মেয়ে ওদের চাক না চাক, তাতে কিছু এসে যায় না, সেই মেয়ের পেছনে লেগে থাকবেই ওরা।

ওদের একটা জাত-ক্রোধ আছে এবংশের ওপর। জিতোর ঠাকুর্দার আমল থেকে সেটা আরো বেড়ে উঠেছে। তার মূলেও ওই একই মেয়ে।

পিলালীকে বিয়ে করে ছিল জিতোর ঠাকুর্দা সরজি। সরজিকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল পিলালী। বাজিয়ার ঠাকুর্দার কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। সরজির কাছে পাঠালে যে আত্মহত্যা করবে। সরজিকে সে একটুও ভালোবাসেনি।

ঠাকুর্দা জিজ্ঞেস করেছিল, তবে বিয়ের মত জানবার সময় পাকা দেখার সময়, ঘরের এক দরজা দিয়ে, দুজনে বেরিয়ে এসেছিল কেন, সবার সামনে ? অমত থাকলে তো, দুজনে দুই দরজা দিয়ে বেরুবে !

পিলালী উত্তর দিয়েছিল—হ্যাঁ, এটা ঠিক কথা। সমাজের

নিয়ম। কিন্তু তখন সে অত বোঝেনি ওর চাতুরি। সরজি শাসিয়েছিল। তোকে আর মুশানাকে শেষ করে ফেলব এক সঙ্গে।

ভয় পেয়ে গেছল সে তাই—

ঠাকুর্দা জীবন পণ করে লড়েছিল। খুশানা শের নাম ছিল ঠাকুরর্দার। শেরের ক্ষমতার কাছে জিতোর ঠাকুর্দাকে হার মানতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

এই পিলালীই তার নিজের ঠাকুরমা। পিলালীর অন্য পক্ষের ছেলে জিতোর বাবা। তারা মায়ের পেছনেও জিতোর বাবা অনেক লেগেছিল, বাবার সঙ্গে পেরে ওঠেনি।

এবারে সাঁওলীকে নিয়ে বাজিয়ার সঙ্গে জিতোর পালা চলছে। এ পালায় জিতো হেরেছে অনেকবার। বেহায়া নির্লজ্জের তবু যদি হুঁশ থাকে! এবারে একটা শেষ কামড়ের চেষ্টা করছে, মরণ কামড়! কিছুতেই সে কামড়ের খোরাক হতে পারবে না বাজিয়া।

বাজিয়া নিজের আগোচরেই তীর-ধনুক তুলে ধরল, সাঁওলী এসে হাত চেপে ধরলে—কি করছিস বইতা! রিনিমা কি রকম ভাবে দেখছে দেখছিস না! খাবার তো ছুদিনের আছে। বাবু বিরক্ত হয়ে উঠছে, বলছে—কাজের সময়ই রোজ যত সব—

জঙ্গলের ভেতর নিয়ে চলল বাজিয়াকে সাঁওলী। ওদের মাথার ওপর দিয়ে কতকগুলো রঙবেরঙের পাখি ঝটপট করে ডানা বাজিয়ে উড়ে গেল।

রিনির কাঁধে হাত রেখে, গা ঘেঁষে চলতে লাগল কৃষ্ণেশ। ছুজনে এক হয়ে চলছে—অভিন্ন হৃদয়ের ছু'টি দেহ।

কাজ শুরু হল ক্রোমাইট ফিল্ডে। বাকি জায়গায় খোঁড়া চলল —ধপাস-ধুপ, ঠক্ঠক ঠুং-ঠুং। ক্রোমাইট মুখ উঁচু করল, মাথা তুলল নীচে থেকে ওপরে—মাটি থেকে—পাহাড় থেকে বাইরে।

ছুটোছুটি চলল সাঁওলী—বাজিয়ার—বাবুকে স্যাম্পেল দেখাল —আবার কাজ শুরু করা। ওরা ছুজনে নিঃশ্বাস নিতে সময় পাচ্ছে

না। সময় চাচ্ছে নাও। মন করলে সময় পত বৈকি। বাবু তো আর অমানুষ নয়। প্রকৃত মানুষ! মানুষ বললেও ভুল করা হবে। সাক্ষাৎ দেবতা। জলজ্যান্ত ঠাকুর। তার সামনে ফাঁকি দেওয়া ঠিক হবে না। অন্যায় হবে। তাই সমস্ত শক্তি এক করে, কোনো দিকে লক্ষ্য না রেখে, কাজের সঙ্গে মন মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ওরা। অন্যের পাঁচ দিনের কাজ ওদের এক দিনের। এই ভাবেই কাজ করে কৃষ্ণেশকে ওরা এত সহায়তা করেছে, যার জন্যে হেড অফিসে কৃষ্ণেশের সব চেয়ে সুনাম।

রিনিকে বলল কৃষ্ণেশ—এদের সাহায্য করতে পারা যাবে না রিনি। বিনিময়ে কিছুই দিতে পারিনি ওদের, কেবল একটু মিষ্টি কথা কয়েছি তাও কাজ নেবার জন্যে। ওরা অক্লান্ত পরিশ্রমী, বিশ্বাসী।

—সত্যিই চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। রিনির কণ্ঠ বিস্ময় ঝরা।

—সাঁওলীটা অসম্ভব কাজের তো! এই ভ্যাপসানি গরমে প্রাণান্ত হচ্ছে আমাদের। সাঁওলীও গলদ ঘর্ম হচ্ছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সে দিকে—বাবুর কাজ—মজুরী দিয়েও কি এ জিনিস কিনতে পাওয়া যায়! এরা যা করছে, এদের খাটুনি দেশ-বিদেশের ঐশ্বর্যের ভিত্তি তৈরি করে দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এদের অন্ধকারের জীবন অন্ধকারেই শেষ হচ্ছে—কেউ জানছে না। জানতে চাইবার দরকার বোধ করে না কেউ! অথচ এদের না হলে এ কাজে এগুনো অসম্ভব। একদণ্ড চলে না।

রিনির কথাগুলো শুনে ভাবাবেগ চাপতে না পেরেই কৃষ্ণেশ বলল—সাঁওলীর কাজ বড় সুন্দর। বাজিয়ার চেয়েও। কেমন সুন্দর ভাবে শাবল চালাচ্ছে ছাখ হাসিমুখে!

রিনি উঠে পড়ে। সাঁওলীর কাছে যায় ব্যস্ত সমস্ত হয়ে। কি হল, কিছু বুঝতে না পেরে, কৃষ্ণেশ পেছু নিল রিনির—কি জানি, রিনির মাথাটা না আবার বিগড়ে যায়! আবার না কিছু করে বসে,

বলে বসে ওদের। আজানা অশঙ্কায় কৃষ্ণেশের বুক দুরদুর করে ওঠে। এ আশঙ্কা কৃষ্ণেশের দুর্বল মনের নয়—সবল-সুস্থ মনের—শান্ত মনের। অশান্তি তার ভালো লাগেনা, তাই অশান্ত পরিস্থিতির ছোঁয়াতে শিউরে ওঠে সে। তার আমোদ-প্রিয় মন কাজের মধ্যে—দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও হাসি-খুশীর পোশাক পরে থাকতে চায়। সাঁওলীর মেহনতের ভেতর সে পোশাক খুঁজে পায় সে—তাই ওকে অত ভালো লাগে। রিনি সাঁওলীর হাত থেকে শাবল চেয়ে নিলে। সাঁওলী তো অবাক—রিনিমার কি হল! দেখবেন হয়তো—ওমা, তা নয়—রিনি নিজেই শাবল চালাতে লাগল। বাজিয়া হতবাক। কৃষ্ণেশ বিস্ময়-বিমূঢ়—এ আবার কি রিনির বাতিক!. সাঁওলীর ওপর সহানুভূতি? ওদের সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া—কিন্তু রিনির জীবনে শাবল ধরা অভ্যেস নেই। সাঁওলী—সাঁওলী পাহাড়ি-বুনো মেয়ে—রিনি কলেজে পড়া মেয়ে। অনেক তফাৎ। সাঁওলীদের বৃষ্টিতে দিন-রাত ভিজলেও কিছু হয় না। রিনির একদিন খানিক্ষণ ভিজেই নিউমোনিয়া হবার উপক্রম। রিনিতে-সাঁওলীতে এক কাজে এক হতে পারে কেমন করে!

—হাতে ফোস্কা হয়ে যাবে যে রিনি! সরে এস! সাঁওলীকে করতে দাও! ও তুমি পারবে না। রিনির হাত থেকে জোর করেই শাবলটা ছিনিয়ে নিয়ে সাঁওলীর হাতে তুলে দিলে কৃষ্ণেশ।

রিনি গুম হয়ে গেল। কৃষ্ণেশের সঙ্গে শিরীষ গাছটার তলায় এসে চুপ করে বসে রইল। খানিক পর কৃষ্ণেশকে বলল—সাঁওলীর মতো আমাকে দেখাচ্ছিল না মুখার্জী? ভালো দেখাচ্ছিল না? সুন্দর?

কৃষ্ণেশ হেসে বলল—খুব ভালো দেখাচ্ছিল। ওর চেয়েও খুব সুন্দর।

কৃষ্ণেশের মুখে অন্তর্দাহের ছাপ ফুটে উঠতে লাগল ক্রমে—রিনি তার জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত! তার চোখে যে কাজ সুন্দর—রিনির চোখেও তাই—যে ভাব ভালো লাগে—রিনিও সেই ভাবে তৈরি হতে—নিজেকে বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তবুও রিনিকে সুখী

করতে পারেনি বে।

—এত অন্যমনস্ক কেন মুখার্জী?

সংবিত ফিরে পেল কৃষ্ণেশ। রিনির দিকে চেয়ে তার আর কষ্ট হতে লাগল। জোর করে হাসি টানতে গিয়েও পারল না। রিনির মনে হাঁকু-পাঁকু ভাব। কৃষ্ণেশের মনে কি হচ্ছে—হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন—জানবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল।

শরীর খারাপ হলে ফিরে চল মুখার্জী! উঠে পড়!

যেটুকু কাজের দরকার সেটুকু হয়ে গেছে। রিনির কথাই রাখল কৃষ্ণেশ। মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে পড়ল।

বাইরে বেরিয়ে দেখলে মাটি ভিজে। গাছের পাতা গড়িয়ে জল পড়ছে টপ টপ করে। একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। গাছের গুহায় জানতে পারে নি কেউ। বাইরের জগৎ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে ছিল কিছুক্ষণ।

ট্রাকের ফোঁসফোঁসানি গর্জানি চলল একটানা। রূঢ় বাস্তবের সংস্পর্শে নিভৃতমনের সুদক্ষ অনুভূতি হারিয়ে যেতে লাগল। কৃষ্ণেশ-রিনির গাছের গুহার ভাবরাজ্য অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা ফিরে এল আবার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভরপুর দুনিয়ায়।

সাঁওলীদের ডেরার ধারে ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ল বাজিয়া। সঙ্গে সঙ্গে সাঁওলী। ওদের দুজনের লাফান চলা—ঝাপ ঠেলে ডেরায় ঢোকা পর্যন্ত মুগ্ধচোখে দেখতে লাগল কৃষ্ণেশ—দুটি তাজাশক্তির চঞ্চল জীবন্ত পুতুল!

রিনির চোখে ঘোলাটে লাগল ওদের—কৃষ্ণেশের তন্ময় চাউনিকে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল রিনি—কিছুতেই মন পাওয়া যাচ্ছে না মুখার্জীর, এত করে শাবল ধরেও!

চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল রিনির। মুখার্জীর মনে সাঁওলী জেঁকে বসে আছে। ও কখনও মুছে যাবে না। মুখার্জী কেবল নিজেকে আড়াল করে রাখতে চাইছে কথার জাল বিস্তার করে। নিজের চোখের তৃপ্তি—মনের তৃপ্তি ঠিকই মেটাচ্ছে কাজের অজুহাত দেখিয়ে,

তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। সে বড় অসহায়! মুখার্জী খালি বড় বড় জীবন-দর্শনের বুলি আওড়াচ্ছে। মানবতার, উদারতার, বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিচ্ছে। এতখানি ধড়িবাজ, এটা বিয়ের আগে পরে একটু বুঝতে পারেনি সে। ধরতে পারেনি মোটে!

রিনির মুখ থমথমে হয়ে উঠল। কৃষ্ণেশ চোখ ফিরিয়ে রিনিকে দেখে, স্তম্ভিত হয়ে গেল।—না, রিনিকে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো। ক্ষণে ক্ষণে রিনির সংশয়-দ্বেষের ঢেউ উঠতে থাকবে—বিরক্তিকর ব্যাপার। এসব নিয়ে থাকলে কাজ-কর্ম ডকে উঠবে। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিচ্ছু হবে না। ঢের হয়েছে। রিনির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল কৃষ্ণেশ।

তাঁবু পর্যন্ত সারাটা সড়ক রিনি কৃষ্ণেশে কোনো কথাই হল না। ওদের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খানখান করে দিচ্ছিল চলন্ত ট্রাক।

কৃষ্ণেশের মৌনতাই রিনির মনে সন্দেহের দানা জমাট বেঁধে বসল। শোনা কথাকে রিনি অবিশ্বাস করেছিল কিন্তু চোখে দেখা কাণ্ডগুলোকে কেমন করে উড়িয়ে দিতে পারা যায়? এর পরও কৃষ্ণেশের স্তোকবাক্য মেনে নিতে হবে? আর সব অবিশ্বাস করতে হবে?

রিনি দৃঢপ্রতিজ্ঞ হয়ে উঠল—আর নয়। চলে না গেলে, সে উন্মাদ হয়ে যাবে। তার পক্ষে অসহ্য—সে হেরে গেল। মুখার্জীর হৃদয় জয় করতে পারেনি, পারল না, পারবেও না। সাঁওলী জয় করেছে। মুখার্জীর মনে সাঁওলী, চোখে সাঁওলী, চিন্তায় সাঁওলী। সাঁওলীর অতল তলে তলিয়ে গেছে মুখার্জী। ওঠা অসম্ভব। তোলা কঠিন।

সারুয়াবিলে এসে, রিনি হারিয়ে ফেলল মুখার্জীকে। রিনির মনের মধ্যে এই কথাগুলো বারবার তোলপাড় করতে লাগল। মনটা হু-হু করে উঠল। তাঁবুতে ঢোকা পর্যন্ত নিজেকে সামলাতে পারল না। ঢোকার মুখেই চোখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সর্ব শরীর কেঁপে উঠল কান্নার দমকে—পা থেকে মাথা অবধি। টলে

পড়ে যাচ্ছিল, দুহাত দিয়ে জাপটে ধরে, ভেতরে নিয়ে গেল কৃষ্ণেশ। চারপাইয়ে বসিয়ে আদর করে ডাকল, রিনু! তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কি জাননা কান্না আমি দেখতে পারি না। কান্না আমায় পাগল করে দেয়? চুপ কর রিনু! চুপ কর!

রিনি চুপ করলে মুখার্জী তাকে, মন থেকে মুছে ফেলে দেয়নি! তার কান্না নিয়েই দুজনে প্রথম পরিচয়—সেই মুখার্জী! সেই নরম মনের মানুষ।

রিনি কৃষ্ণেশের হাত দুটো ধরে কান্না-ভেজা গলায় বলল—মুখার্জী! তোমার কথামত চলবার অনেক চেষ্টা করলুম। পারলুম না। মন আমার ক্রমশই নীচে—অনেক নীচে নেমে যাচ্ছে। তোমার অশান্তির কারণ হতে চাই না। তোমার উঁচু মনের কাছে আমার নীচু মন খাপ খাইয়ে চলতে নারাজ। তাকে আয়ত্তে আনতে পারছিনা। পারবও না! ডুকরে কেঁদে উঠল রিনি। আছড়ে পড়ল বিছানায়।

কৃষ্ণেশ মহাসমস্যায় পড়ল।

রিনি, তুমি কি চাও বল!

তুমি তো জানো মুখার্জী! বারে বারে আর বিরক্ত করতে চাইনা। যা হবার নয়—হতে পারে না—তাই চাই! রিনি পাগলের মতো হি-হি করে হেসে উঠল!

আঁতকে উঠল কৃষ্ণেশ—রিনির এ-রূপ ছ্যাখেনি কোনো দিন—কান্নার সঙ্গে হাসি! হাত দুটো ধরে সজোরে ঝাঁকুনি দিল—রিনি! রিনি!

রিনির দাঁতি লেগে গেছে—সমস্ত দেহটা লোহাশক্ত। —রিনির ফিট! আবার! বিয়ের আগে বার দুয়েক ফিট হতে দেখেছিল কৃষ্ণেশ। তখন কারণ ছিল—কৃষ্ণেশ জানে সে সব—ডাক্তারবাবুরাও বলেছিলেন—রিনির সহ্য করে করে—সহ্যের বাইরে অনেক ঝড় বয়ে গেছে—ওর ওপর দিয়ে—মন দুর্বল হয়ে গেছে—স্নায়ু কমজোর—ও যেন নিশ্চিন্তে থাকতে পারে—অতিরিক্ত ভাবনা-চিন্তা করলেই এ

ব্যাধি পেয়ে বসবে। কখনো ছাড়বে না। দিন দিন প্রকোপ বাড়বে বই কমবে না। খুব হুঁশিয়ার!

রিনির জীবনে এই প্রথম ফিট শুনে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ডাক্তারবাবুরা রিনির মনের অবস্থা, তার পারিবারিক অবস্থা জানতে চেয়েছিলেন কৃষ্ণেশের কাছে—রোগটার উৎপত্তি বার করবার জন্যে—জড় মারবার জন্যে।

যতটুকু রিনির মুখে শুনেছিল কৃষ্ণেশ, সবই এক এক করে বলেছিল। তাঁরা নির্দেশ দিয়েছিলেন—অতীতটা ওকে মনে করতে দেবেন না··ভুলিয়ে রাখবেন। আর ওর মনের ওপর কোনো অশান্তির রেখাপাত যাতে না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন—এই হচ্ছে এর প্রধান ওষুধ।

বাহাদুরকে দিয়ে দিয়ে জল আনিয়ে রিনির মাথায় মুখে ছিটোতে লাগল কৃষ্ণেশ। খানিক পর একটা বুকভাঙা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলল রিনি—শুকনো গলায় আস্তে আস্তে বললে—একটু জল! বুকটা বড্ড শুকিয়ে গেছে!

রামবাহাদুর দিতে যাচ্ছিল, কৃষ্ণেশ নিজেই শশব্যস্ত হয়ে, বাহাদুরের হাত থেকে গেলাস কেড়ে নিয়ে, রিনির মুখে একটু একটু করে ঢালতে লাগল।

রিনি চোখ চাইল। উঠে বসতে যাচ্ছিল—বাধা দিল কৃষ্ণেশ—উঠতে দিল না। রিনির বুকের ওপর মুখ রেখে বলল—এখন কেমন বোধ করছ?

ভালো। রিনির ক্ষীণ কণ্ঠ।

কৃষ্ণেশ মনস্থ করলে, যত শীগগির এখান থেকে ফেরা যায়, ততোই ভালো। সে বেশ বুঝতে পারছে সাঁওলীর জন্যে রিনির মনে একটা ভয়ঙ্কর ভীতি বাসা বেঁধেছে! সাঁওলীর কাজ বন্ধ রাখাই ভালো। যে কদিন কাজ হয়, সাঁওলীর বদলে পরজিকে দিয়েই চালান হক—এছাড়া উপায় নেই।

বিদেশ বিভুঁইয়ে রিনির বাড়াবাড়ি হলে—মহাবিপদে পড়তে

হবে!

কৃষ্ণেশও সব বুঝে-সুঝে এতদিন রিনিকে নিয়ে ঘর করেও নিজের জেদের বশে, রিনির মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। রিনির ওপর পীড়ন করেছে। সাঁওলীকে ও সহ্য করতে পারে না। অনেকবার সরল ভাবে, বেশ খোলা মনেই বলেছে—কিন্তু কৃষ্ণেশ শোনেনি রিনির কোনো কথা—গ্রাহ্য করেনি। গুরুত্ব দেয়নি—উল্টে—।

অনুশোচনার ধারাল দাঁতগুলো তার মাথার মধ্যে কুরে খেতে থাকে। কৃষ্ণেশ জানে—রিনির সে ছাড়া জগতে আপনার বলতে কেউ নেই—

সাঁওলী সাঁওলী করে এত মাতামাতি করাটা তার ভালো হয় নি। অন্তত রিনির অপছন্দর কাছে—মনের ভাবটা চেপে যাওয়া উচিত ছিল। রিনির পুরনো ব্যাধিকে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনল সে নিজেই। রিনি যে তাকে আত্মসমর্পণ করে আছে—তার মুখ চেয়ে আছে—

রিনির কাছ থেকে উঠে পড়ল কৃষ্ণেশ। পায়চারি করতে লাগল ঘন ঘন। উৎসুক নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখছে রিনি কৃষ্ণেশের অস্থির ভাব!

—মুখার্জী! আমাকে নিয়ে তুমি সব দিক দিয়েই বিব্রত হয়ে পড়ছ! যদি কিছু মনে না কর বলব?

রিনির কাছে এসে বসল কৃষ্ণেশ! উন্মুখ আগ্রহে বলল, নিশ্চয়ই!

—বাহাদুরকে দিয়ে আমায় পাঠিয়ে দাও! আবার আমার ফিটটা ধরল—তুমি একলা পেরে উঠবে না। কাজ—আমি—

দৃঢ়কণ্ঠে বলল কৃষ্ণেশ, তোমাকে পাঠাতে পারি না। আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাব। তুমি ভেব না। তুমি আমার পাশে থাকলে আমি ঘর-বার ঠিক ম্যানেজ করে নেব। যে রকম আকাশের অবস্থা হয়ে আসছে—বাকি কাজ ফেলে রেখেই ফিরতে হবে। পরজিকে দিয়ে এ কদিন কাজ করাব ভাবছি। সাঁওলীকে ছুটি দোব।

রিনির মুখ চোখ হাসি খুশীতে ভরে গেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কাজ থেকে ফিরে অবধি বাজিয়া রিনিরই গুণ গাইতে লাগল কেবল—রিনিমা যেন মাটির মানুষ। যেমন বাবু দেবতা, তেমনি মা-ঠাকরুন দেবী। জুড়ির তুলনা হয় না। এত এসেছে, এত গেছে, তো—এদের মতো কেউ নয়।

—দেখলি তো সাঁওলী? তোর হাত থেকে শাবল কেড়ে নিয়ে, কি রকম রিনিমা কাজ করতে লাগল! কুলি-কামিন মালিক-মজুর জ্ঞান নেই। সবাই সমান। কত সহানুভূতি আমাদের ওপর! কত দরদী মন ওর! শ্রদ্ধাবিনম্র চিত্তে, জোড় হাতে কপালে ঠেকাতে লাগল রিনির উদ্দেশে বার বার বাজিয়া।

সাঁওলীর মনে দোল খেতে লাগল, রিনিমা দেবী। কেন, সেও কি রিনিমা হতে পারে না? পারে না দেবী হতে? তাতে রিনিমাতে তফাৎ কি? দুজনেই তো মানুষ! রিনিমা আগলে রেখেছে বাবুকে! আজকাল কাজে আসতেও আরম্ভ করে দিয়েছে। নিজেই শাবল ধরেছে। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে—রিনিমাই তার কাজে যাওয়া বন্ধ করেছিল। রিনিমাকে বাজিয়ারও ভালো লাগল। আমাকে নয়।

রিনিমা সাঁওলীর জায়গা দখল করবে? চেনে না সাঁওলী বাঘিনীকে এখন? সাঁওলীর থাবায়—কুকরি-টাঙিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে ননির পুতলী। বাজিয়ার ওপর নজর। রিনিমার যাদু করা বার করে দেবে সাঁওলী।

ফুঁপিয়ে উঠল সাঁওলী—থাম। সাঁওলী কোনোদিন ভুলতে পারে না কোনো কথা—তুই না বলেছিলি, রিনিমা বলেছে বাবুকে, এদের সঙ্গ ছাড়—এরা হাসতে হাসতে খুন করতে পারে—হরিণ শিকার নিয়ে ?

এখন রিনিমা দেবী। মুখ ভেঙচে সাঁওলী বলল, রিনিমা শয়তানী।

ঠাস করে গালে চড বসিয়ে দিলে বাজিয়া—খবরদার। ফের যদি কিছু—

সাঁওলীও ছাড়বার পাত্রী নয়, সেও দুহাতে খিমচে কামড়ে রক্তারক্তি করে দিলে বাজিয়ার সর্বাঙ্গ। বাজিয়া চুলের মুঠি ধরে কিল-চড় লাথিতে হাত-পা পিঠে কালশিটে পড়িয়ে দিল। দুজনে খানিক ধস্তাধস্তি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

বাজিয়া নারকেলের মালায় হাণ্ডিয়া ঢেলে সাঁওলীর মুখে তুলে দিল—সাঁওলী বাজিয়ার মুখে—

দুজনে খুব হাসাহাসি করতে লাগল। ফেটে পড়বার যোগাড়।

নেশায় বুঁদ হয়ে রাতের ঘুমন্ত কোলে ঢলে পড়ল প্রকৃতির দুরন্ত শিশু, অবোধ শিশু—হিংস্র শিশু বাজিয়া সাঁওলী। সকালে ট্রাক এসে হাজির সাঁওলীদের ডেরার সামনে। কারো পাত্তা নেই।—না সাঁওলী, না বাজিয়ার। আগেকার অভ্যাসে কৃষ্ণেশ নামতে যাচ্ছিল। বাজিয়াকে ডেকে তুলতে—রিনি বলে উঠল—তুমি আবার কেন ? ড্রাইভারকে দিয়ে খোঁজ নাওনা—খবর দাওনা ?

কৃষ্ণেশ বসে পড়ল। ড্রাইভারকেই পাঠান হল। বলে দেওয়া হল সাঁওলীকে আসতে হবে না। বাজিয়া যেন একলাই আসে।

ড্রাইভার ফিরে এল। কৃষ্ণেশকে জানাল—এত মাতাল হয়েছে ওরা—। টানাটানিতেও উঠতে পারছে না। নেতিয়ে পড়েছে। রাত্তিরে খুব টেনেছে !

কৃষ্ণেশ বলল, মাথায় জলফল ঢেলেও বাজিয়াকে তোল। কাজেব হরজা হবে যে—জলদি যাও।

ড্রাইভার 'সাঁওলী' বলে, কি বলতে যাচ্ছিল—থমকে গেল কৃষ্ণেশের

শ্যেন দৃষ্টিতে। সে কথা বলাও যায় না—অন্তত বাবুর সামনে, রিনিমার সামনে। আর তাছাড়া কথাই তো আছে, নেশার খেয়ালে, কি দেখিনু দেয়ালে। নেশায় মানুষ কি না বলে! ভাগ্যিস বাবু রিনিমা গিয়ে পড়েন নি, গেলে কি অনর্থ না ঘটত!

সাঁওলী বোধ হয় স্বপ্নই দেখছিল কিছু—ডাকাডাকি করতেই চোখ বুজে বুজে জড়ান গলায় বলে চলল—বেরিয়ে যা রিনি! তোকে আর রিনিমা বলছি নে! উনি মা! শয়তানী এক নম্বরের। দূর-হ! খবরদার, বাজিয়াকে ছুঁসনা! গায়ে হাত দিবিনা! নিয়ে যাবিনা বলছি—খুন করে ফেলব! খুন করে ফেলব!

সাঁওলীর একি স্বপ্ন! রিনিমাকে নিয়ে! মনের কথা মনেই রেখে দিল ড্রাইভার। প্রকাশ করলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

বাজিয়ার সঙ্গে মিনিট দশেক টানা-হেঁচড়া যোঝাযুঝি—জল ঢালাঢালি করে তুলে নিয়ে এল ড্রাইভার।

এই বাজিয়া! সিধে হয়ে বস বলছি! কৃষ্ণেশের ধমকানিতে সচেতন হয়ে উঠল বাজিয়া। মাথা ঝোঁকা নুইয়ে পড়া দেহটাকে বারে বারে তুলে ধরতে লাগল—শিরদাঁড়া খাড়া রেখে, সিধে হয়ে বসতে চেষ্টা করল।

কিন্তু সম্পূর্ণ নেশা না-চটা পর্যন্ত ট্রাকের ঢুলুনিতে, স্প্রিংয়ে বসান মাথার মতো, এপাশ ওপাশে মাথার আনাগোনা চলতে লাগল।

ফিল্ডে কাজ করল একলাই বাজিয়া। যা হক করে কাজ চালিয়ে দিল। সাঁওলী নেই। পরজিও নেই। পরজিকে খবর দেবে কে? বাজিয়ার তো সকাল থেকেই অচৈতন্য অবস্থা।

কাজ শেষে কৃষ্ণেশের হুকুম হল বাজিয়ার ওপর—কাল থেকে পরজিকে আসতে বলে দিতে। বাজিয়ার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছিল—বাবু! সাঁওলী? কৃষ্ণেশ উত্তর দিয়েছিল—এখন যা কাজ পরজিই পারবে। পরজি না হলেও চলবে—একটা তোর মতো লোকের একারই কাজ আছে শুধু।

বাজিয়া আর কিছু বলতে পারে নি। বাবু বোধ হয় হাণ্ডিয়া

খেয়ে পড়ে থাকার রেগেছে—বিরক্ত হয়েছে। তাই এই সব ব্যবস্থা! সর্বনেশে মেয়ে ওই সাঁওলী! যত অনাসৃষ্টি বাধালে—না উঠে। এর আগে এরকম তো অনেক হয়েছে। বাবু নারাজ হয়নি। আর প্রায় দিনই হতে থাকলে—বাবুর দোষ কি? কাঁহাতক সহ্য করা যায়—উত্যক্ত হয়ে উঠেছে বাবু!

বাজিয়া মনমরা হয়ে পড়ল। ডেরায় ফিরে সাঁওলীর ওপর ঝাল ঝাড়ল, তোর নিজের জন্যে নিজেই মরলি! বাবু নাকচ করেছে। খুব হাণ্ডিয়া খেয়ে গড়াগড়ি যা এবার!

থাম হতচ্ছাড়া মিনসে! তোকে কেউ সর্দারি করতে বলেনি। আমাকে নিয়ে তোর মাথা ঘামাবার দরকার নেই! নিশ্চয় জিতো চুকলিখোর বাবুর মন ভাঙিয়েছে—রিনিমার কানে কামড়েছে। আমি সব বুঝতে পারছি। না হলে এতোদিন রিনিমাই বাবুকে পবামর্শ দিয়ে বাবুর মাথাটি খাচ্ছে একেবারে—সোনার বাবুকে। সাঁওলীব চোখ দুটোয় হিংস্র নাচুনি। এর প্রতিশোধ নেবে সে জিতোর ওপর —রিনিমার ওপর।

বলে দিস তোর রিনিমাকে—দেবীকে। সাঁওলী চায়না ওদের কাজ করতে। রিনিমাই সর্বনাশের মূল।

আবার! মুখ সামলে সাঁওলী! রিনিমার নাম নিবি তো—

ও আমার রে! দেখ মিনসে, কাল থেকে তোকে কাজে যাওয়া বন্ধ করতে হবে! কিছুতেই যাবিনে! বাবু পরজিকে দিয়ে হক. যাকে দিয়ে হক করাক। সে সব জমাখরচে দরকার নেই আমাদের!

আমি যাব, তোর কেনা গোলাম নই যে, কথা শুনতে বাধ্য!

আলবত! রিনিমার কথা শুনবি তবে? বাবু রিনিমার কথায় ওঠে বসে—তোকেও আমার কথায়—রিনিমাকে দেখলে, ওর কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে ওঠে।

বাজিয়া ক্ষেপে উঠল। রাগে অগ্নিশর্মা। সজোরে সাঁওলীর বুকে লক্ষ্য রেখে লাথি ছুঁড়ল। বসে পড়ল সাঁওলী! প্রতিজ্ঞা করল, এর প্রতিশোধ নিতে হবে—এক ঢিলে দুই পাখি মারতে হবে।—

বাজিয়া-জিতো—জিতো-বাজিয়া।

বাজিয়া সাঁওলীর কাছে এসে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসতে লাগল—আচ্ছাই খলিফা তুই! লাথিটা একটুও লাগল নারে! একেবারে ফসকে গেল—শূন্যে ছোঁড়া হল স্রেফ!

এরপর।

রিনির মন-মেজাজ খুব শান্ত এখন। আগেকার মতো স্বাভাবিক। কোনো রকম উত্তেজনা রাগ-দ্বেষ-ক্ষোভ, মান-অপমানের বালাই নেই তার। কৃষ্ণেশের মনেও পরিতৃপ্তি।

বাজিয়াকে দিয়েই কাজ চালান হচ্ছে। সাঁওলীর নাম গন্ধ করে না কেউ। সাঁওলী অনেক নিষেধ করেছে বাজিয়াকে—তুই যাসনে কাজে, ভালো হবে না কিন্তু। কে-কার কথা শোনে—সাঁওলীর কোনো ওজর আপত্তিই শোনেনি বাজিয়া। সে রোজ নিয়মিত বাবুর সঙ্গে কাজে যায়। সাঁওলী বাঁশের বেড়ার ফাঁকে চোখ রেখে—মরণ আর কি—বাবুর পাশে বসে হেসে খুন একেবারে রিনিমা! বাজিয়া বাঁদরটাও মজেছে। ওদের হাসিতে উনিও নেচে নেচে উঠছেন! দাঁত বার করা মুখে পুরু ঠোঁট দুখানা কি বিচ্ছিরিই না দেখাচ্ছে! ঘেন্নায় মরি! রিনিমার আবার কি ঢলাঢলি বাবুর সঙ্গে—গায়ে পড়াপড়ি—আপাদ-মস্তক জ্বলে ওঠে!

মাটির মেঝেয় পা ঠোকে সাঁওলী—লাথি মারি—লাথি মারি। মতলব ভাঁজতে থাকে। এই অবসর। রোজ সারাটা দিন বাজিয়া থাকে না—জিতোকে ডেকে এনে একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে।

জিতোর কাছে গিয়ে অনুনয় বিনয় করাল সাঁওলী—তোর জন্যে মন-প্রাণ কেমন করেরে! এখন তো আর কেউ থাকে না, যাস না একবার করে!

জিতো তো স্বর্গের চাঁদ হাতে পেল। সাঁওলীকে এত বলতেই বা হবে কেন? সে তো সাঁওলীর জন্যে দিন গুনছে। এত ফাঁদ পাতছে, এত কাণ্ড ঘটাচ্ছে। সাঁওলীর নামে বাবুর নামে রটাবার উদ্দেশ্যই তো একটা কেলেঙ্কারি সৃষ্টি করে—বাজিয়াকে রাগিয়ে দিয়ে,

সাঁওলীকে ছাড়ান। বাবুর আওতা থেকে বার করা। নিজের কবজায় এনে ফেলা। যাক, সে ইচ্ছে তার একটি চালেই ফলেছে—রিনিমার কান ভারি করতে পারায়।

আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল জিতো—নিশ্চয়—নিশ্চয় যাবরে সাঁওলী, তুই কিচ্ছু ভাবিনা!

—শোন জিতো! আমার ঘরে নয়—বুঝলি? মুখ পোড়ার যা সন্দিগ্ধ মন—কোনো সময় যদি এসে পড়ে! তার চেয়ে বাবু তাঁবুর কাছে আমতলায় আসিস! ওখানটা খুব নিরিবিলি জায়গা! কাল নয়, পরশু ওর ফিরতে দেরি হবে, সেই রকমই শুনেছি। তুই সন্ধ্যের একটু আগে আসিস, আমি বসে থাকব তোর মুখ চেয়ে—তারপর? তারপর সটান কেটে পড়ব দুজনে এদেশ ছেড়ে। ভুরু নাচিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, মুচকি হেসে ঠমকে ঠমকে কোমর দুলিয়ে চলে যায় সাঁওলী! যাওয়া পথে ফিরে ফিরে চাইতে থাকে। সাঁওলীর চলন-ভঙ্গীতে চোখ আটকে যায় জিতোর—নিমেষ-নিহত দৃষ্টি। কত মাথা খাটাতে হয়েছে সাঁওলীর জন্যে। সাঁওলীরে! কি নেশা ধরালি চোখে!

রাত্তিরে সাঁওলী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব কথাই জানাল বাজিয়াকে। বলল—এই সময় লড়ে যা বাজিয়া—তীরের লড়াই। একেবারে বুক ছেঁদা করে, এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যাবে জিতোর। বাবুও সে সময় থাকবে। দেখবে, জিতো হারামির বজ্জাতির সাজা!

মনে মনে হেসে উঠল সাঁওলী। বাজিয়া রাজী। তার কারসাজি বুঝতে পারেনি। ধরতে পারেনি। এক তীরে দুই পাখি! তীরের লড়াইয়ে একজনের লাগার সঙ্গে সেও প্রাণপণে বিপক্ষকে লক্ষ্য করে মারবেই, সে মরণ-মার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অব্যর্থ—মোক্ষম। জিতোও তীর ছোঁড়ায় কম যায় না। বাজিয়ার সমান সমান। হি-হি করে ছুরি বেঁধান হাসি হেসে ওঠে সাঁওলী!

তুই পাগল হলি নাকি? নিজে নিজেই হাসছিস!

সাঁওলীর চোখের কোণে বাজ পড়ার বিদ্যুৎ ঝিলিক—এদুটো শেষ হলে—তারপর। তারপর রিনি শয়তানীকে নিজের হাতে—

নিষ্কণ্টক হয়ে যাবে সাঁওলী। বাবু আর সে—বাজিয়ার গলা জড়িয়ে বললে সাঁওলী—বাজিয়ারে! পরশু—পরশু—পরশু।

বাজিয়াও অনেকদিন ধরে সুযোগ খুঁজছে জিতোর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে মেলবার। সে যোগাযোগ ঘটিয়েছে সাঁওলী। সাঁওলী বাঁচবে এতে—জিতো মরবে—বাবু-রিনিমার সন্দেহ-দ্বিধা-অপবাদ-কলঙ্ক ঘুচবে।

বাজিয়া পরশুর ব্যাপারিটা শুনিয়ে দিল বাবু-রিনিমাকে—কৃষ্ণেশ রিনি তখন বেশ খোশমেজাজেই ছিল। ফিল্ডের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে কৃষ্ণেশ। যেটুকু অবিশ্যি তার দায়িত্ব—আর দিন পনেরর মধ্যে ফিরে যাবে রিনিকে নিয়ে। রিনি খুব খুশী।

বাজিয়ার কথা শুনে কৃষ্ণেশ হতভম্ব হয়ে গেল—সাঁওলীর এ আবার কি কাণ্ডকারখানা! তার তাঁবুর সামনে খুনোখুনি হলে—ম্যাও সামলাবে কে? সে চায় না এ সব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটুক। জিতোর ধর্ম জিতো পালন করেছে—জিতো কুকুর—সবাইকেও কি জিতোর মতো হতে হবে?

রিনি আপত্তি জানিয়ে ছিল—কদিনের জন্যে—আর এ সব না করাই ভালো।

বাজিয়া জোড়হাত করে বলেছিল—মা, বাবু! মানা কর না! ওর হিম্মতের পরীক্ষা করব। একটু খেলাব—ওকে দিয়ে স্বীকার করাব—ও মিথ্যুক। কোনো ভয় নেই, তোমাদের খুনোখুনি হবে না—কথা দিচ্ছি—আমি স্থির করেছিলুম, এবারে ওকে শেষ করব নিশ্চয় কিন্তু—তোমাদের জন্যে এবারেও রেহাই পেল।

সাঁওলী যে বাজিয়া আবার রিনি কৃষ্ণেশকে, জিতোর আসবার কথা বলে দিয়েছে—এব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানে না জিতো। জিতো নির্দিষ্ট দিনে, ঠিক সন্ধ্যে হবার পূর্বেই, আমতলায় এসে উপস্থিত।

তখন আকাশের অবস্থা তুলোপেঁজা মেঘে ভরা, দিনের গুমসনো গরম-ভাপ কাটতে শুরু করেছে সবে। সূর্যও ডুবে গেছে খানিকক্ষণ।

পশ্চিমের আকাশটায় রামধনু উঠেছে আড়াআড়ি ভাবে। আকাশের একটা ঘোলাটে আলোয় পাহাড়মাটি-গাছ-গাছালি-মানুষ—সব যেন কেমন ম্যাড়মেড়ে ভাব—

আমতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অধীর প্রতীক্ষায় একবার এদিক, একবার ওদিক তাকাচ্ছে ঘন ঘন জিতো—সাঁওলীর দেরি হচ্ছে কেন? শেষে না ফ্যাসাদ হয়! বাজিয়া টের পেলে হুলুস্থূল—বাধা—সব পণ্ড হয়ে যাবে। ক্রমশ বাবু, অন্য লোকজন না এসে পড়ে!

পেছন ফিরতেই দেখে, সাঁওলী আসছে সর্বাঙ্গ নাচিয়ে। তার সমস্ত যৌবন যেন উছলে পড়েছে—যাকে পাবার জন্যে কত কাণ্ড—মারামারি—দাঙ্গা-হাঙ্গামা—তবুও পাওয়া যায় নি—আজ সহজেই বিনা যুদ্ধে তাকে জয়লাভ করা, কম ভাগ্যের কথা নয়। আনন্দে ফেটে পড়ছে জিতো—মনে হল, দৌড়ে গিয়ে, পাঁজাকোলা করে তুলে নেয়। সাঁওলী এক পা এক পা এগুচ্ছে—তর সইছে না জিতোর। —সাঁওলী পা ফেলায় না জানি কত কষ্ট হচ্ছে। জিতোর বুকে বাজতে লাগল। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দৌড়ল। নিজের দুরন্ত-উচ্ছাসের রাশ টানতে না পেরে সাঁওলীর হাত দুটো চেপে ধরল—আহত ফণিনীর মতো ফুঁসিয়ে উঠল সাঁওলী—হুঁশিয়ার জিতো! হাত ছেড়ে দে শীগগির।

জিতো থতমত খেয়ে গেল—হাত ছেড়ে দিয়ে দুপা পেছিয়ে এল। সাঁওলী কোমরে ঝোলান খাপ থেকে কুকরি টেনে নিল। জিতোকে দেখিয়ে বলল—এগিয়েছিস—কি পেছিয়েছিস—মৃত্যু থেকে রেহাই পাবি না।

তার চেয়ে লড়ে যা বাজিয়ার সঙ্গে—তুই জিতলে তোর সঙ্গে বাসর হবে—বিয়ে হবে আমার। মরদের বাচ্চার মতো লড়বি বাজিয়ার সঙ্গে—ধনুকের লড়াই।

গর্জে উঠল জিতো—থাম শয়তানী। ডেকে নিয়ে এসে—

সাঁওলী বিদ্রূপের হাসি হাসল—ঠোঁট বেঁকিয়ে মিহিগলায় বলল—ভয় কি? আমি দেব তীর-ধনুক!

গাছের বেড়ার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল বাজিয়া। বাজিয়ার সমস্ত দেহটা ফুলে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। বাজিয়া যত জিতোর সামনে এগুতে থাকে—জিতোর বুকটার লাফানি তত দ্রুত ওঠা-নামা করতে থাকে। নিরস্ত্র জিতো বিষধর সাপের সামনে কুঁকড়ে কেঁচোর মতো হয়ে আসছে। এক গ্রাসে গিলে খেয়ে ফেলবে এখুনি বাজিয়া তাকে। ভয়ে, থরথর নিঃসহায় চোখ দুটো তুলে ধরল বাজিয়ার চোখে জিতো—তাকাতে পারল না মোটে, সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিল।

বাজিয়া জিতোর ঘাড়ে হাত দিতে, জিতো শিউরে উঠল। সারা শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে জমে আসতে লাগল। জিতোর অন্য সময় লম্প-ঝম্প কম নয়। বাজিয়ার কাছে পরাজয় মেনেছে জিতো অনেকবার—এটা ঠিক যে, বাজিয়া ছাড়া অন্য কাউকে সে ভয় করে না। তাদের চুলের মুঠি ধরে শূন্যে তুলে, ছুঁড়ে ফেলে দেবার ক্ষমতা রাখে জিতো। জিতো বড় নাচারে পড়েছে—দলছাড়া—অস্ত্রছাড়া—।

জিতোর চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলে উঠল।—মুণ্ডুখসা পিঁপড়েও কামড়ে থাকে মরবার সময়। ছাড়ে না! মরণকামড় কামড়াতে উদ্যত হয়ে উঠল জিতো। বুক ফুলিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। সমস্ত পেশীগুলো ইস্পাতকঠিন শক্ত হয়ে উঠল।

চুপ করে চেয়ে আছে একদৃষ্টে—বাজিয়ার গতিপথে। তার চোখ দু'টো কড়া পাহারা দিচ্ছে। কোথা থেকে, কোন দিক দিয়ে আক্রমণ আসে বাজিয়ার। কখন বাজিয়া বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর!

সেও বাঘের বাচ্চা—হরিণের নয়। শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিয়ে চেষ্টা করবে—মরবার সময় ওকেও মেরে মরতে। দাঁত কড়মড় করে উঠল জিতোর। বাঁকা চোখে চেয়ে দেখল একবার—সাঁওলী রগুড়ে হাসি হাসছে—তাকে নিয়ে মজা পেয়েছে—খেলা পেয়েছে। ওকে আগে মেরে মরতে পারলে শাস্তি পেত জিতো।

সাঁওলী একগাদা তীর আর দুটো ধনুক নিয়ে এল গাছের আড়াল থেকে। জিতোর চোখে আক্রোশের আগুন ছুটছে। ষড়যন্ত্র করে আনা তাকে—অস্ত্রশস্ত্র সব লুকিয়ে রাখা! ঠিক করে রাখা!

সাঁওলী আটটি তীর আর ধনুক তুলে দিল বাজিয়ার হাতে। বাজিয়া তীর ছোঁড়বার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগল।

জিতোর সামনে বাজিয়া তীর নিয়ে, পেছনে সাঁওলী ভোজালি নিয়ে দাঁড়াল। জিতোর শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা সামনে বাজিয়াকে ঘায়েল করতে পারলে—সাঁওলীকে ঘায়েল করার জন্যে ভাবতে হবে না জিতোকে। জিতোর লক্ষ্য একমাত্র বাজিয়ার তীরের ফলা—নিশ্চয় বিষাক্ত সাপের বিষ মেশান। বুকে কেন, যেখানেই বিঁধিয়ে দিক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে কাজ আরম্ভ—'উঃ' বলবারও সময় পাওয়া যাবে না —এ বিষ সেও জানে। পাহাড়ি শঙ্খচূড়ের বিষ!

জিতোর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

বজ্র-গম্ভীর স্বরে হুঙ্কার ছাড়ল বাজিয়া—বাবুর তাঁবুর কাছে এগো! এক পা এধার ওধার করেছিস কি—তীরের ফলাটা জিতোর চোখের সামনে নাচাল বার দুয়েক।

জিতো দেখছে তার চোখের তারায় ছোবল মারতে ফণা দোলাচ্ছে শঙ্খচূড় সাপ।

চোখে মারলে এ বিষ আর নামান যাবে না। একেবারে মাথায় চড়ে যাবে মুহূর্ত মধ্যে—সাক্ষাৎ যমদূত। নির্ঘাৎ মৃত্যু।

কৃষ্ণেশের তাঁবুর সামনে নিয়ে এল জিতোকে, বাজিয়া-সাঁওলী নজরবন্দী করে। বাহাদুরকে বলল বাজিয়া—বাবুকে-মাকে খবর দিতে।

রিনি কৃষ্ণেশ তাবু থেকে বেরিয়ে এল সন্ত্রস্তভাবে। একটা অঘটন না ঘটে শেষে! জিতোর কাছ থেকে প্রায় হাত তিরিশেক দূরে দাঁড়াল বাজিয়া। সাঁওলী জিতোর হাতেও আটটি তীর ও ধনুক তুলে দিল।

দুজনই তৈরি হল তীর ছুঁড়তে। রিনির ওই দৃশ্য দেখেই মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। ভেতরে চলে গেল। রুদ্ধশ্বাসে দেখছে কৃষ্ণেশ—বাজিয়া তীর ছুঁড়ল—জিতো সেই তীরটির গতির মোড় ঘুরিয়ে দিল তার ছোঁড়া তীরের আঘাত দিয়ে।

এবার জিতো ছুঁড়ল—বাজিয়া ঘোরাল। তিনবার এই মরণ যুদ্ধ চলবার পর অসহিষ্ণু হয়ে উঠল কৃষ্ণেশ।—যে কোনো মুহূর্তে কারো লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেলে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হবে!

কৃষ্ণেশ আদেশের স্বরে বলে উঠল—এখুনি থামা বলছি! নয়ত তোদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াব—দেখি তোরা—

কে কার কথা শুনবে। তখন দুজনেরই রক্তের নেশা। চোখে এ ওর বুকের রক্ত দেখছে।

থামবে কে? চলতে লাগল এক ভাবেই তীর ছোঁড়াছুঁড়ি। জিতোর হাত কেঁপে উঠছে এক একবার আটকাতে। প্রথমেই নিরস্ত্র অবস্থায়, তার স্নায়ুর ওপর—মনের ওপর প্রচণ্ড নিঃসহায় ভাবের চাপে খানিক দুর্বল হয়ে গেছল সে। যদিও তীর-ধনুক পেয়ে রক্ত গরম হয়েছিল—সাহস এসেছিল—উত্তেজনা হয়েছিল, কিন্তু তার পাশে পাশে, মাঝে মাঝে সাঁওলীর ভোজালি হাতে ঘুরে বেড়ানয় কেমন যেন মনোবল ভেঙে যাচ্ছে।

চারটি তীর ছোঁড়াছুঁড়ির পর—পাঁচ বারের বার বাজিয়া খুব সামলে নিল, ওর হাতটা দারুণ কেঁপে উঠেছিল। এদিকে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে জিতোও অবসন্ন হয়ে পড়ছে। প্রতি তীরে ওর হাতে দেহে অবশ ঝিমুনি।

ছয়—এবার বাজিয়ার আটকাবার আর জিতোর ছোঁড়বার পালা। অবস্থা ভালো না দেখে, কৃষ্ণেশ বাহাদুরকে বলল—তোমাকে জিতোর হাত দুটো আর আমাকে বাজিয়ার হাত দুটো চেপে ধরে, বন্ধ করতে হবে এখুনি এই মরণযুদ্ধ। বাজিয়া যতই কথা দিক—প্রতিশ্রুতি দিক—ভয় নেই, যা দেখা যাচ্ছে বাজিয়া এখন খুনের নেশায় মেতে গেছে। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে!

সেই ভাবে দাঁড়াল বাহাদুর কৃষ্ণেশ—দুজনে দুজনার পেছনে—বাজিয়ার পেছনে কৃষ্ণেশ আর জিতোর পেছনে বাহাদুর। তীর ছোঁড়ার মুখেই দুজনকে আটকাতে হবে।

জিতো তীর ছুঁড়তে যাচ্ছে—বাহাদুর ধরবার আগেই নিজে হুমড়ি

খেয়ে পড়ে গেল—তীর ছোঁড়া হল না তার! বাজিয়ার মাথায় এমন খুন চেপে গেছে যে, তীর যুদ্ধের নিয়ম ভেঙে সে জিতোর বুক লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তে চেষ্টা করল। পারল না। কৃষ্ণেশের সুদৃঢ় হাতের বাঁধন ছাড়াতে পারলে না। খুলতে পারল না।

জিতো মাথা নীচু করে বসে রইল তার পরাজয়ের গ্লানিতে। বাজিয়া তার মুখ দিয়ে ক্ষমা চাওয়াল—জিতো স্বীকার করল সব কথা। বাবু—সাঁওলীর নামে সে যা বলেছে মিথ্যে—একেবারে মিথ্যে—একটুও সত্যি নয়!

রিনিকে ডেকে সব কথাই শোনান হল। আকাশের ঘোলাটে মেঘ কেটে তখন নীল সমুদ্র। রিনির মনের মেঘ কেটে সেখানে কৃষ্ণেশের চোখের দুটি নীল তারা ফুটে উঠল।

জিতো প্রতিজ্ঞা করল, এ গাঁয়ে আর থাকবে না। চলে যাবে গাঁও ছেড়ে যেখানে দু'চোখ যায়। তার ঘেন্না হয়ে গেছে সাঁওলীর ওপর। সাঁওলীর আশা সে চির জীবনের মতো ত্যাগ করল। সাঁওলী যা তার সঙ্গে করেছে আজ এ ঘা দগদগে হয়ে থাকবে তার বুকে মরণ অবধি। এর আগে ঢের হলেও—এতখানি বোকা বনে কোনো দিন ফাঁদে পড়েনি সে। এ ভাবে পরাস্ত হয়নি—এ ক্ষতের জ্বলুনি কোনো দিনই ঠাণ্ডা হবে না।

জিতো মাথা নীচু করেই চলে গেল। সাঁওলী হেসে কুটিকুটি—বাজিয়াটা রইল তাহলে। দেখা যাক!

এত কাণ্ড হয়ে যাবার পরও কৃষ্ণেশ কিন্তু সাঁওলীকে কাজে ডাকল না আর।—দরকার নেই। রিনি ভালো আছে এখন। সাঁওলীও যেতে চায়নি আর। বাজিয়াকেও বলে না আর। বাজিয়াও কাজের কোনো কথা তোলে না ওর কাছে।

কেটে গেল সাতদিন। বাজিয়া, কৃষ্ণেশ, রিনি রোজই ফিল্ডে যায়, আবার আসে। রিনি এখন কৃষ্ণেশের কাছে গিয়ে ছেলেমানুষী ভাবে আঙুল দেখাতে থাকে—ডান হাতের পাঁচটা বাঁ হাতের তিনটে, মোট আটটা—আর আটটা দিন আছে যাবার। তার পরের দিন আবার বাঁ হাতের দুটো, ডান হাতের পাঁচটা দেখিয়ে উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে—আর সাত দিন—

কলকাতা ফিরতে আর সাত দিন বাকি!

ফিল্ড থেকে ফিরে এসে দেখে রিনি—তার শাড়ি-জামা সব তছনছ হয়ে পড়ে আছে—চার ধারে ছড়ান।

আশ্চর্য হয়ে যায় রিনি-কৃষ্ণেশ। বাহাদুরকে ডেকে জিজ্ঞেস করায় সঠিক উত্তর পাওয়া গেল না।—সে কিচ্ছু জানে না। জেগে ছিল বেলা দুটো অবধি। তখনো কাউকে আসতে দেখেনি এখানে। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিল—

কৃষ্ণেশ ধমকে দিল—এমন ঘুম যে, তাঁবুর ভেতর কেউ ঢুকে জামা শাড়ি নিয়ে ছড়াছড়ি—পাউডার কেসটা গড়াচ্ছে—সেন্টের শিশিটা খোলা পড়ে—এসব কি ব্যাপার?

বহুত হুঁশিয়ারসে নজর রাখোগে বাহাদুর!

বাহাদুরের লজ্জা মেশান উত্তর—জি হুজুর বা! বদমাশকো পাকড়নেসে জানমে মার ডালুঙ্গা!

নহি কভি অ্যায়সা মত্ করনা। হমলোগ আকে যো কুছ করনা হ্যায়—করেগা। পাকড় কর রাখ দেনা!

জি হুজুর!

জিতো চলে গেছে গাঁও ছেড়ে। সেই ঘটনা হবার পর। সাঁওলীর আক্রোশটা দিন দিন বেড়ে উঠছে রিনির ওপর। সাঁওলী সব শুনেছে—বাবু চলে যাচ্ছে—আর কদিন বাদেই। তার মনটা খাঁ খাঁ করে ওঠে। বাবুকে আটকান গেল না। রিনিমাই নিয়ে যাচ্ছে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে। বাজিয়া এখন আবার রিনিমা বলতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সাঁওলীকে শাসায়—কোনো গোলমাল করবিনে বলছি—করলেই রিনিমার সঙ্গে চলে যাব কলকাতায়। রিনিমা নিয়ে যাবে বলেছে! সাঁওলীর মাথায় বজ্রপাত হয়।—রিনিমা এত তার পেছুনে লেগেছে! বাবু—বাজিয়া—তুটোকে নিয়ে সরছে কেন? কেন?

সাঁওলীর মাথার ভেতর 'কেন'র ঘুরপাক অনবরত চলতে থাকে। কান-মাথা গরম হয়ে ওঠে।—কিসের এত জোর রিনিমার?

সাজগোজের? শাড়ি-জামার? তাই দেখে লোকে ভুলে যাবে বাবুর মতো। কথায় কথায় উঠবে-বসবে? দেখাচ্ছি—

সাঁওলীর মাথায় তুষ্টুবুদ্ধি চেপে বসে। তাঁবুর আশেপাশে ঘোরে, লুকিয়ে লুকিয়ে—বাবু বেরিয়ে যাবার পর থেকে। বাহাতুরকে পাহারা দিয়ে বেড়ায় সাঁওলীর ভাসা ভাসা চোখ তুটো। বাহাতুরের ঘুমোনোর সুযোগ নিয়ে ঢুকে পড়ে তাঁবুর ভেতর। রিনিমার জামা-কাপড় শুঁকে শুঁকে ছাখে—কি গন্ধ আছে? শাড়ি পরতে গিয়ে—জামা গায়ে দিতে গিয়ে, পাট ভেঙে একাকার করে ফেলে। পাউডার মাখতে—সেণ্ট মাখতে—বাহাতুরের আওয়াজ পেয়ে পালিয়ে যায়।

পালিয়ে গেলে কি হবে—ডেরা অবধি সারাটা রাস্তা গজরাতে গজরাতে গেছল সাঁওলী—রিনিমার শাড়ি জামা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দিতে পারল না। আপসোসের আকর্ষণই সাঁওলীকে আগামী কালের প্রতীক্ষায় ঠেলে দিল।

পরের দিন।

সাঁওলী উসখুস করছে—বাজিয়ার বেরনর জন্যে উৎসুক হয়ে আছে। বাজিয়াকে বারে বারে জিজ্ঞেস করছে—যাবি না? ট্রাক

এল না ? আজ এত দেরি কেন রে ?

বাজিয়া অবাক ! এখনো সময় হয় নি, সাঁওলী এত ব্যতিব্যস্ত কেন ! তুই কি নতুন হলি নাকি, এতদিন কাজ করে ? এখনো আর একটু দেরি আছে ট্রাক আসতে। আর একটু দেরি যেন তার কাছে অনেকটার সমান হয়ে দাঁড়াল। ঘরবার করতে লাগল সাঁওলী।

ট্রাকে উঠতে বাজিয়া, সাঁওলী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বাঁশের দেওয়ালে ঝোলান কুকরিটা নামিয়ে নিল। কোমরে ভালো করে বেঁধে নিল ফেরতা দেওয়া কাপড়ের খুঁটে। যদি জেগে ওঠে বাহাদুর —যদি বাধা হয় তার কাজে—যদি ধরা পড়ে যায় সে—তাহলে—তাহলে বাহাদুরের কুকরি দিয়ে ওকে শেষ করতে হবে—সাক্ষী-সাবুদ নিশ্চিহ্ন।

হুজুর বেরিয়ে যাবার পর থেকে বাহাদুরের সজাগ মন, সতর্ক দৃষ্টি ঘুরে ফিরতে লাগল তাঁবুর চার পাশে।—আজ বদমাশকে ধরবে সে। ঘুমুবে না, বাঁশি বাজাবে না, আমতলায় যাবে না। তাঁবুর পেছনে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকবে। কোন ধার দিয়ে আসে কে—একবার দেখতে হবে। তার শ্যেনদৃষ্টি থেকে আজ আর কারো রেহাই নেই। —হুজুরের কাছে বড় বেইজ্জতি হয়েছে কাল। মুখ তুলে তাকাতে পারেনি মোটে। একটা প্রতিকার করতে না পারলে তার নিস্তার নেই—সোয়াস্তি নেই।

সাঁওলী গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে লাগল। না, কেউ কোথাও নেই। বাহাদুর শয়তানটাকেও দেখা যাচ্ছে না কোনো দিকে।

সাঁওলী পা টিপে টিপে, এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে তাঁবুর কাছ বরাবর এল। আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছুঁড়ে মারলে চারদিকে—কেউ আসছে কিনা, কেউ দেখছে কিনা। কান উৎকর্ণ হয়ে উঠল—কারো পায়ের শব্দ—না নিঃশ্বাসের ! সাঁওলীর মনের ভুল স্রেফ !

ছটফটে বাহাদুরের দারুণ অবস্থা। দম বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে আছে। মশার কামড়ে পা-হাত ফুলে লাল হয়ে উঠছে—জ্বলে খাক

হয়ে যাচ্ছে তবু নড়বার উপায় নেই! বাহাদুরের চোখের লেন্সে সাঁওলী তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে। পা থেকে মাথা অবধি গরম রক্তের স্রোত বয়ে গেল বাহাদুরের।—এত বড় হারামি—নিমক-হারাম! বাবুর নুন খেয়ে—তার জিনিস নষ্ট—অনিষ্ট করতে আসা—চুরি করতে আসা! ওকে খুন করে ফেললেও রাগ যায় না। মনে হচ্ছে দৌড়ে গিয়ে ভোজালিটা বুকে বসিয়ে দেয়।—না, মা-বাবুর বারণ। বাহাদুর ধরবার জন্যে উঠতে যাবে—সাঁওলী চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল তাঁবুর ভেতর পা বাড়াতে গিয়ে।—কিসের খসখসে আওয়াজ? কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল।

মাটির সঙ্গে মাথা গুঁজে শুয়ে পড়ল আবার বাহাদুর। তাঁবুতে ঢুকুক আগে, জিনিস-পত্রে হাত দিক আগে—তারপর হাতে-নাতে ধরবে সে—অস্বীকার করবার উপায় থাকবে না। পালাবার যো থাকবে না।

সাঁওলী কুকরিটা কোমর থেকে খুলে নিল। বাহাদুরকে দেখা যাচ্ছে না। কোথাও গেছে হয় তো—যদি এসে পড়ে—কুকরির বাঁটটা ভালো করে মুঠোর মধ্যে চেপে ধরল সাঁওলী। বাহাদুরের ভয় করে না ও।

সাঁওলী তাঁবুর ভেতরে ঢুকে পড়ল। গতকালের মতো রিনির শাড়ি-জামা বার করে পরল। গায়ে কাপড়ে সেণ্ট দিল। পাউডার নিয়ে সমস্ত মুখে-গায়ে মেখে নিলে—সবটাই অনভ্যস্ত হাতে বলে—অগোছাল ভাবটা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ হয়ে পড়ল সাঁওলীর সাজ-গোজে।

অনেকদিন একদৃষ্টে দেখছে রিনিকে সাজতে সাঁওলী। রিনিও তার পাউডার মাখান পাফটা ওর মুখে বুলিয়ে দিয়েছে। সেণ্টের শিশিটা খুলে ওর গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছে—গন্ধে ভরপুর হয়ে গেছে বাতাস-মন!

সাঁওলী সমস্ত অনুকরণ করল রিনির—কিন্তু রিনির মতো হল না! আয়নায় মুখ দেখে হেসে বাঁচে না সাঁওলী—এবার জব্দ হবে

রিনিমা। সাঁওলী সব নিয়ে যাবে—যত শাড়ি-জামা, পাউডার সেণ্ট।

পুঁটলি বাঁধল শাড়ি-জামার সাঁওলী।—দেখা যাক, কিসে কিসে ভোলে এবার বাবু—কিসে ভোলে বাজিয়া! সবাইকে এবার সাঁওলীর পেছু পেছু ঘুরতে হবে, কথায় ওঠ-বোস করতে হবে রিনিমার মতো।

তাঁবুর পর্দা ফেলা কাপড়ের দরজার পাশে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে বাহাদুর।

সাঁওলী বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে, ওর ডান হাতের কবজিটা চেপে ধরল।

সাঁওলীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলল কিছুক্ষণ। হাতের ভোজালি খসে পড়ে গেল সাঁওলীর।

কাপড়ের পুঁটলি গড়াগড়ি যেতে লাগল। সাঁওলীকে পিছমোড়া করে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে দিল বাহাদুর!

সাঁওলীর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরোচ্ছে। একবার ছাড়া পেলে হয়—বাহাদুরকে ডালকুত্তার মতো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে সে। বড় বেকায়দায় ধরে ফেলেছে তাকে।—মরদের বাচ্চা হবি তো, খুলে দিয়ে বাঁধুক ফের দিকি নি? গর্জে উঠল সাঁওলী।

উগ্র-মেজাজী বাহাদুরের ডান হাতের তেলোটা উত্তপ্ত হয়ে উঠতে লাগল ক্রমে। সমস্ত শরীরের শক্তি এসে জমতে লাগল ওই জায়গাটায়। রাশ টেনে রাখতে পারল না হাতটার। ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল সাঁওলীর গালে। সাঁওলীর গালে পাঁচ আঙুলের ছাপ এঁকে গেল।

সাঁওলী মুখ খুলল না একদম। একটু উঃ-আঃ-ও করল না। চোখে জল এল না। শুধু চোখ দুটো বড় বড় করে তাকাল একবার রামবাহাদুরের মুখের দিকে। সে দৃষ্টি নিঃসহায় নয়—করুণ নয়। আবেদন অনুরোধের ধার ধারে না। দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রার্থী নয়।

সাঁওলীর নীরব দৃষ্টি কেবল বাহাদুরের পায়ের নখ থেকে মাথার

চুল অবধি বুলিয়ে গেল, যেন বাহাদুরের পায়ে পাহাড়ি গোখরো কামড়াল। বিষকে শরীরের শিরা-উপশিরার রক্ত-স্রোতের মধ্যে দিয়ে বইয়ে মাথায় তুলে দিল।

প্রায় ঘণ্টা চারেক ধরে একই অবস্থায় পড়ে রইল সাঁওলী। বাহাদুর একটা মোড়ায় বসে আছে সাঁওলীর সামনে। পাহারা দিয়ে রেখেছে। পালিয়ে না যায় কোনো প্রকারে। বাহাদুরের দুমুখো দৃষ্টি, একবার সাঁওলীর দিকে—একবার হুজুরের আসা পথে ঘোরা-ফেরা করতে লাগল। খুশী উপচে পড়ছে বাহাদুরের চোখে-মুখে।—মা বাবু খুব আনন্দ পাবেন—তাকে ইনাম দেবেন! বাঁশিতে গান ধরল বাহাদুর—চল, চলরে নওজওয়ান……।

ট্রাকের হর্নে দাঁড়িয়ে বাহাদুর। রিনি কৃষ্ণেশকে সেলাম জানাল। সাঁওলীর দিকে আঙুল দেখাল—এহি বদমাশ অওরত—পাকড় গ্যয়ি।

রিনি কৃষ্ণেশ হতভম্ব হয়ে গেল। পরস্পরে চোখ-চাওয়া চাওয়ি করল।

কৃষ্ণেশের গলায় উত্তেজনা ফেটে পড়তে লাগল—জলদি খুলে দাও! বুদ্ধু কোথাকার!

ইতস্তত করছিল বাহাদুর, ধমকে উঠল কৃষ্ণেশ। হুকুম মান যাও!

বাহাদুর সাঁওলীর বাঁধন খুলে দিল। হাত পায়ে বাঁধার দাগ হয়ে গেছে। গালটাও ফুলে উঠেছে পাঁচটা দাগ নিয়ে। সাঁওলীকে হাত ধরে তুলে বসাল কৃষ্ণেশ। জল খাওয়াল। ওর গাল-হাত-পা দেখে, বাহাদুরকে বকাবকি করতে লাগল—অউর তুমকো ইহাঁ নহী রাখ্‌খেঙ্গে—অভি চলা যাও! যাও! ট্রাকমে বৈঠকে স্টেশনমে—

বাহাদুর কি অন্যায় হয়েছে তা বুঝল না। হুজুরের ভালো করতে গিয়ে মন্দ হল! তাজ্জব ব্যাপার! যা যা ঘটেছিল, সবই বলল কৃষ্ণেশকে।

কৃষ্ণেশের প্রচণ্ড রাগ হল বাহাদুরের কথা শুনে—তোমাকে বলেই

গেছি তো ধরে রাখতে। মারতে, এভাবে বাঁধতে বলে গেছি কি? তুমি খুন করতে বসেছিলে একটা মেয়েছেলেকে—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য—একেবারে বে-আদব!

গোঁ চেপে বসল কৃষ্ণেশের—আমার সামনে থেকে চলে যাও।

ড্রাইভারকে বলে দিল কৃষ্ণেশ—বাহাদুরকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে ট্রেনে চাপিয়ে দিতে। রিনি মৃদুস্বরে আপত্তি জানিয়েছিল—ও যখন বলছে—যদি কসুর হয়ে থাকে মাপ করতে, তখন থেমে যাও না! আর তো চার-পাঁচটা দিন। অবুঝ—অত বুদ্ধি থাকলে কি আর বাঁধুনিগিরি করে?

কৃষ্ণেশ খেঁকিয়ে উঠল রিনিকে। বাহাদুরের ওপর রাগটা ঝাঁপিয়ে পড়ল রিনির ওপর—আস্পর্ধা দিও না সামনা-সামনি। মাথায় উঠে যাবে। ও যা করেছে—অমানুষিক। কোনো ক্ষমা নেই—বাজিয়া শুনতে পেলে, জানতে পারলে, ঘাড়ে আর ওর মাথা থাকবে না।

কেন, বাজিয়াকে বুঝিয়ে বললে হবে না?

তুমি চুপ করে থাক বলছি রিনি! আমার কথার এক চুল নড়চড় হবে না। বাহাদুরকে যেতে হবে এক্ষুনি—এই মুহূর্তে।

রিনির আত্মাভিমানের দরজায় কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল। কাটল ধরল। তবু আর একবার বলল লাজলজ্জার মাথা খেয়ে—ও অনুতপ্ত, কাঁদছে। তোমাদের কাছে ছোটবেলা থেকে তো মানুষ—অবিশ্বাসী নয় তো! ভুলচুক মানুষেরই হয়।

কৃষ্ণেশ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, ড্রাইভার, অভি—অভি লে যাও ইসকো—

বাহাদুরকে আটকাতে পারল না।

কৃষ্ণেশ সাঁওলীর হাতে কাপড়ের পুঁটলিটা তুলে দিলে—তুই এটা নিয়ে যা। পরতে ইচ্ছে—তা আগে বলিস নি কেন এতদিন—বেশ মানিয়েছে তোকে। রিনিমার জর্জেট শাড়ি এই পাঁচটা টাকা নে, সেজে-গুজে হাওয়া খাবি, কেমন?

সাঁওলীর বিছের জ্বালা জুড়িয়ে গেল বাহাদুরের যাওয়ায়। বাবুর

আদরে—পাওনা-খোওনায় গলে পড়ল সাঁওলী। হেসে লুটোপুটি খেতে লাগল। বাবুর মনে ধরেছে তাকে। রিনিমার শাড়ি—এই শাড়ির গুণেই বাবুকে জয় করেছিল রিনিমা!

রিনির দিকে আড়চোখে চেয়ে আরো খিল খিল করে হেসে উঠল সাঁওলী। ভাবটা—কেমন জব্দ করেছি এবার— সাঁওলীর সঙ্গে লাগা! সাঁওলী কেড়ে নিয়েছে বাবুকে রিনিমার কাছ থেকে—জয়ের গৌরবে সাঁওলী ঝিনঝিনি ধরা পা-কে আলতো ভাবে তুলে, একটু সামনে-পেছনে খেলিয়ে টলে টলে কাছে এসে দাঁড়াল, কৃষ্ণেশের গা ঘেঁষে।

রিনির হাবভাব-ঢঙ-ঢাঙ-কথা-বার্তায় গন-গনে আগুনের হলকার দাপাদাপি চলছে। মাঝে মাঝে সাঁওলী মুখ বিকৃত করে রিনির দিকে সেই গা জ্বালান দাপা-দাপি ছুঁড়ে মারছে। রিনি অস্থির হয়ে পড়ছে। তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

সত্যি! সব সত্যি! জিতো যা বলছিল, এসবের ভেতরে মস্ত বড় একটা ষড়যন্ত্র—তার চোখে ধাঁধা লাগান। জিতোকে ধরে এনে, নাস্তানাবুদ করে, গাঁ ছাড়া করল—এর মধ্যেও সাঁওলী-মুখার্জী-বাজিয়ার যোগসাজস। বাহাদুরকেও এই ভাবে সরানর ছুতো তৈরি করে ছিল আগে থেকে। রিনির কপাল সত্যিই এতদিনে ভাঙল। আর জোড়া লাগবেনা। মুখার্জী যাবে না কোনোদিন! তার সঙ্গে রীতিমত অভিনয় চলছে। মুখার্জী পাকা অভিনেতা! সব মিথ্যে-মিথ্যে-মিথ্যে।

রিনির জর্জেট শাড়ি মানায় ভালো সাঁওলীকে! না জিজ্ঞেস করেই, মত না নিয়েই তার সব জামা শাড়ি সাঁওলীকে দাতব্য করা—কি স্পর্ধা মুখার্জীর! সাঁওলীরই কি স্পর্ধা—তার দিকে চেয়ে, হাসি মশকরা করতে সাহস করে মুখার্জীর শেখান পড়ান না থাকলে! প্রশ্রয় না থাকলে!

আর কোনো বিশ্বাস নেই মুখার্জীর ওপর!

সাঁওলী খুশী হয়েই মুখার্জীর দেখা দেখি হাত নেড়ে টা-টা টা-টা করতে করতে হেলে দুলে চলে গেল।

রিনি তাঁবুর ভেতর চলে গেল। কৃষ্ণেশের সঙ্গে আর কোনো কথাই কইল না। কথা কইবারই বা কি আছে তার! সব ফুরিয়ে গেছে। বোঝাবুঝির পালা হয়েছে অনেক। উপরোধ অনুরোধ—বিনয়, মান-অভিমান দুঃখু সব করা হয়ে গেছে—বলা হয়েছে যথেষ্ট! এখন নয় সহ্য কর—নয় মর—নয় স্থান ত্যাগ!

শিউরে ওঠে রিনি! একবার স্থান ত্যাগ করবার সময়ই বুকে টেনে নিয়েছিল মুখার্জী। সেদিনও কুলহারা সে পথের মেয়ে। তার দাঁড়াবার নেই। যে ধারেই চেয়েছে রিনি, আশ্রয়হীনার চোখে জলে জলময় হয়ে ভেসে উঠেছে। সেই ডোবা অবস্থায়, মুখার্জী কর্ণধার হয়ে এল তার চোখের সামনে।

হ্যাঁ, মুখার্জী রিনির জন্যে কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলে নিয়েছিল। পরোয়া করেনি। সমাজ-জাত মানে নি। পরিচয়ের শেকল ধরে টানাটানি করেনি। কি মহৎ—কি উদার ভেবেছিল মুখার্জীকে সেদিন রিনি!

আর আজ—সেই—এই! না। আগের মুখার্জী বিদায় নিয়েছে তার কাছ থেকে। এ মুখার্জী পশুদের সাথী—বন্য পশু।

বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল রিনি। কৃষ্ণেশ পাশে বসে ওর রেশমী চুলের ভেতর আঙুল চালাতে লাগল—

রিনি বোঝে! ওরকম না করলে, বাহাদুরকে না পাঠালে একটা খুন হয়ে যেত এখুনি। কেউ-ই রুখতে পারত না! আর পাঁচদিন বাদে চলে যাচ্ছি যখন, চাই না নতুন করে ওদের নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি হক আবার একটা।

রেগে গেলে ওরা যে কি ভয়ানক হিংস্র হয়ে ওঠে, তা তোমার ধারণার বাইরে। কতবার একথা বলেছি তোমাকে। বনের বাঘ-বাঘিনীকে তবু রেহাই কিন্তু ওদের হাত থেকে নিস্তার নেই!

রিনির কানে কোনো কথাই ঢুকছে না কৃষ্ণেশের। রিনি কাঁদছে তো কেঁদেই চলেছে এক নাগাড়ে।

—রিনির সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে যদি সুখী হয়, তো হক মুখার্জী,

তার একটুও দুঃখু নেই এতে। সে সর্বহারা হয়েই মুখার্জীর কাছে আশ্রয় পেয়েছিল। সাঁওলীকে যা দিয়েছে—সেও মুখার্জীর। তার কিছু নয়! কিন্তু মুখার্জী যে তার, আর কারো নয়—এতদিনে সে ধারণা মিথ্যে হয়ে গেল। এতেই দুঃখ বেশি। সব হারিয়ে যাকে পাওয়া—সেই হারিয়ে গেল সাঁওলীর কাছে!

রিনি ডুকরে কেঁদে উঠল। কৃষ্ণেশ বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে অসহায় ভাবে বলল, রিনি! তুমি এরকম কাঁদলে—অস্থির হলে, আমার মনোবল, কর্মশক্তি সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে—নষ্ট হয়ে যাবে।

রিনির অচেতন কান সচেতন হয়ে উঠল। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল যেন—এ যে বহু—বহু পুরনো কথা শুনছে সে! তার বাবা রমেন মিত্রের কথা। রমেন মিত্র কথা কইছে মুখার্জীর মুখ দিয়ে। বিস্ময় বিস্ফারিত জলভরা চোখ দুটো তুলে ধরল কৃষ্ণেশের চোখে।

—এখনো মনে পড়ে রিনির। মনে পড়বেও মৃত্যু অবধি তার। ভুলতে পারবে না সে এ কথাগুলো। এ কথাগুলো তার মর্মে মর্মে বিঁধে আছে।

তখন রিনির কত আর বয়েস হবে—বছর সাতেক। বাবা মধ্য-প্রদেশের কোরবা কোলফিল্ডে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি নিয়ে গেলেন। সঙ্গে গেলেন মা আভারানী আর বাচ্চা মেয়ে রিনি।

কোয়ার্টারে বেশ কাটল কিছু দিন। রিনির ভালোই লাগত জায়গাটা। পাহাড়ি জায়গা—উঁচু-নীচু চড়াই-উতরাই, ঢেউ-খেলান রাস্তা। মাঝ মধ্যে শাল-মহুয়ার পাহারা। উঁচু মাথার সেপাই

ওরা। পাহারা দিচ্ছে আদিবাসীদের ঝুপড়ি। ওদের নাচ-গান-হুল্লোড়ের টুকরো আওয়াজ হাওয়ায় দুলে ভেসে আসে কোয়ার্টারে।

রিনি কান পেতে শোনে ঢোলের তাল—না বোঝা ভাষায় গান। বড় মিষ্টি লাগে তার এ বাজনা—এ গান। সে স্বপ্নলোকে চলে যায়। ওরা কারা? ওরা ওখানে আসে না কেন? ওখানে কি যেতে পারা যায় না? ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে রিনির প্রশ্নের জবাবে আভারানী বোঝাতে থাকেন, ওখানে কুলি-কামিনদের আড্ডা। ওরা এখানকার আদিবাসী। ওরাই তো রামাঝার কোল মাইনে মজুরের কাজ করে। খনির ভেতর গাঁইতি-শাবল চালিয়ে কয়লার পাহাড় কাটা ওদের জীবিকা! মেয়েরা টুকরি বোঝাই কয়লা জমা করে বাইরে চালানের জন্যে। রিনির বাবার আণ্ডারে কুলি ওরা। বাবুকে খুব মান্য করে।

রিনি ধরে বসে মাকে—ওদের ওখানে নিয়ে যেতে। আদুরে মেয়ের আব্দার রাখতে মা তখনকার মতো, ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' বলেন। বাবুকে বলে কয়ে ব্যবস্থা করা হবে।

মা কবে ব্যবস্থা করবে, কচি মনের রিনির তর সয় না! বাবু কোলিয়ারি থেকে ফিরলে, রিনি গলা জড়িয়ে ধরে বলে, বাবু, আদিবাসীদের গান শুনব, নাচ দেখব—নিয়ে চল!

একমাত্র মেয়ের কথা রাখতে বাবু তখুনিই বেয়ারাকে দিয়ে কৃষ্ণরাজুকে ডেকে পাঠায়।

কৃষ্ণরাজু এল। রঙ কৃষ্ণের মতো। মাথায় চুলের ঝুঁটি, সেই রকম উঁচু করে বাঁধা। তাতে আবার ময়ূর-পালক। ছবিতে দেখা কৃষ্ণের ছবির সঙ্গে লোকটির হুবহু মিল একেবারে। সুঠাম গঠন। টানা টানা চোখ। বাঁকান ভুরু। খাড়া নাক। হাসিটি বেশ মিষ্টি। ঠোঁটের ফাঁকে সুন্দর দাঁতগুলো চকচক করছে। এক কথায় সুপুরুষ বলা যায়!

কৃষ্ণরাজুর সমস্ত দেহই নগ্ন। কেবল একটা কাছি পরা নেংটির মতো।

জোড় হাতে মাথা ঝুঁকে, রমেন মিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। ভাঙা হিন্দিতে বল্লে—সাব! ক্যা হুকুম?

রমেন মিত্র রিনির বায়নার কথা জানাল। এও বলল—তুম আকর বাচ্চিকো থোড়া গানা-বাজনা শুনানেসে উসকি দিল খুশ হোগি।

রিনির দিল খুশী হবে কৃষ্ণরাজুদেব গান-বাজনা শুনে—রমেন মিত্রের এই কথা শুনে কৃষ্ণরাজু আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল।

—জরুর! জরুর! আজ ছুট্টি হো যানে কে বাদ—শামকো—

হাসতে হাসতে চলে গেল কৃষ্ণরাজু। রিনির মনে হয়ে ছিল সেদিন—কত আপনার তার কৃষ্ণরাজু।

সন্ধ্যায় ঠিক কথা রেখেছিল কৃষ্ণরাজু। এসেছিল দলবল নিয়ে, সংঘার-মির সঙ্গে করে—ঢোল-করতাল হাতে ঝুলিয়ে।

দূরের গান-সুর বাজনা, খুব কাছে বসে শুনেছিল রিনি। রিনির মা-বাবাও। বিদেয় দেবার সময় আভারানী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেছিল কৃষ্ণরাজুকে ছুটি-ছাটাতে আসতে। ওদের খণ্ড্ নাচটাও বেশ ভালো লেগেছে। সন্ধ্যেটা মন্দ কাটলো না।

কৃষ্ণরাজু আভারানীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—নিশ্চয়ই, মেম-সাবেব আদেশ শিরোধার্য। জরুর যায়েঙ্গে।

ছুটি হলেই আর রমেন মিত্রকে ডেকে পাঠাতে হত না। আভা-রানীকেও মনে করিয়ে দিতে হত না। কৃষ্ণরাজুরা সন্ধ্যে হলেই এসে এসে পড়ত। বাংলোপ্যাটার্নের কোয়ার্টারের দালানে, অর্কিড্ ঝোলান টবের নীচে গানের আসর বসত। ছুটিতে ওখানে গানের আসরের কথা লোক মুখে মুখে বেশ প্রচার হয়ে গেছল আশ-পাশে। আশ-পাশের লোক নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, ছোট কচিকাঁচারাও এসে জুটত। জমায়েত হয়ে বসত সকলে।

হাসি-হুল্লোড়-হাততালির মধ্যে পরিবেশটা নতুন রূপ পেত—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার যাদের—বাঁচার তাগিদে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে, মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখছে যারা প্রতিদিন কয়লার খনির

ভেতর—তারা যে মৃত্যু-ভয়হীন আনন্দের প্রতিমূর্তি এক একটি—গানের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে, এই রূপটিই প্রকাশ হয়ে পড়ত বেশি। নির্ভীক অমৃতের পুত্র!

সাত বছরের রিনির চোখে তখন এ দৃষ্টি ছিল না। তার মনের মণিকোঠার মণি তখন চঞ্চলতার কাদায় মাখা। স্থির চিন্তার উজ্জ্বলতায় জ্বলজ্বলে হয়ে জ্বলছে না। এখন যে জিনিসকে, যে ভাবে দেখছে, বিশ্লেষণ করছে রিনি—পনের-ষোল বছর আগে তা তার সম্ভব ছিল না। আজকের সম্ভব সেদিন জন্মগ্রহণ করে নি।

রিনি এসব ভাবের কথা, দর্শনতত্ত্বের কথা মা-বাপের আলোচনার মধ্যে দিয়ে শুনত—না বুঝলেও বুঝতে চেষ্টা করত। আনন্দময় মূর্তিটা কি, না জানলেও কৃষ্ণরাজুদের সকলেকেই বেশ ভালো লাগত তার।

কৃষ্ণরাজুর প্রতিবেশীর মেয়ে পার্বতীও আসত এই গানের আসরে। এখনো মনে পড়ে তাকে রিনির। রিনির তার ওপর রাগ দুঃখ-আক্রোশ কিছু ছিল না তখন—এখনও নেই—কিন্তু তার কথা মনে পড়লে, রিনির বুকে হাতুড়িপেটা যন্ত্রণা হয় আজো—পার্বতীকে কোনো দিন ভুলতে পারবে না রিনি। হ্যাঁ, পার্বতী তাকে ভালো-বাসত—বুকে চেপে ধরত। আদর করত।

মা পার্বতীকে রোজ একবার করে আসতে বলত। বাবাকে অনুমতি দিতে বলত—পার্বতী ভালো মেয়ে, রিনিকে ও বড্ড ভালো-বাসে। কলকাতায় জ্যাঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনেদের ছেড়ে এসেছে—ছেড়ে এসেছে খেলার সাথীদের। মেয়েটা কলকাতায় যাব—কলকাতায় যাব করে হেদিয়ে পড়ছিল। কৃষ্ণরাজুদের আসাতে অনেকটা মন ঘুরেছে তবু। পার্বতীটার বড় নেটিপেটি মেয়েটা।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের হুকুম তামিল করবার জন্যে নসিবে হাত দিয়ে বসে থাকে সবাই। কার বরাতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সুনজর পড়ে কখন, এই অধীর প্রতীক্ষায় ক্ষণ গোনে কুলিকামিনরা। ওর সুপারিশে তাদের ভাগ্য ফিরলেও ফিরতে পারে।

পার্বতী রোজ নিয়ম করে আসতে লাগল রিনিদের কোয়ার্টারে।

ষোল বছরের পার্বতী কিশোরী দশা অতিক্রম করে তরুণীর খাতায় নাম লিখিয়েছে। তার দেহের প্রতি অঙ্গ সবুজের ডাকে সাড়া দিয়ে উঠেছে। চির-বসন্ত এসে বাসা বেঁধেছে। পার্বতীর চলনে-বলনে-ধরন-ধারণে তাজা যৌবন উথলে পড়ছে।

পার্বতীকে আহা-মরি সুন্দরী বলা যায় না সত্যি, তবু সে সুন্দরী। মাজামাজা রঙ। ছোটখাট চেহারা। বুকে একটুকরো আর কোমরে একটুকরো কাপড় জড়ান। নাক মাট—চোখ ছোট। কিন্তু কোণগুলো বেশ টানা—কাজল টানা যেন। হাসিখুশী ভাব। কথা হুক না হুক হেসে গড়িয়ে পড়ে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। হাসির দাপটে চোখের জলের ফোঁটা পাতা ভেজায়।

মা বলে, পার্বতী কি সরল—কি ভালো মেয়ে। রিনির উপযুক্ত খেলুনি পাওয়া গেছে। সান্ধ্য-সকালটা কাটে ভালো। কিন্তু সারা দুপুরটা তো আর পাওয়া যায় না। কয়লা তোলার কাজে থাকে। ওই সময় রিনি বড্ড একলা। আনমনা হয়ে বসে থাকে বারান্দায়। গালে হাত দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে চুপ করে।

ওকে দুপুরটা রাখবার ব্যবস্থা করলে হয় না ?

বাবা বলে ছিল, দেখি, কাজ বন্ধ করালে খাবে কি ?

কেন, ওর যা রোজ—সেটা দিলেই তো হতে পারে।

তা বটে, এ একটা যুক্তিসঙ্গত কথা। কিন্তু কাজ ছেড়ে, আয়ার কাজ—

মুখ থেকে কথা কেড়ে নেয় মা।

আয়ার নয়, রিনির বন্ধু হিসেবে—তার বিনিময়ে মজুরি নয়—পুরস্কার দেওয়া হবে তাকে। ঠিক আছে, তোমার বলতে বাঁধা থাকলে আমি বলব, তোমার অমত আছে কি ?

না। তুমিই বল তাহলে।

রিনির জন্য পার্বতীর থাকবার ব্যবস্থা হচ্ছে শুনে রিনি মাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে লাগল। জিদ ধরল, এখুনি ব্যবস্থা করতে।

আভারানীর কথা মেনে নিয়েছিল হাসিমুখে পার্বতী। কোন দ্বিরুক্তি করে নি। এক কথায় রাজি হয়ে গেছল। তারও সুন্দর সুন্দর মেয়েটাকে ছেড়ে কালো কয়লার চুবড়িতে মন বসছিল না। সেও ভেবেছিল, মেমসাবকে এখানে কাজ দিতে বললে কেমন হয়? ভয়ে কিছু বলে নি। পাছে একুল-ওকুল দুকুল যায়। সাব যদি রেগে যায় শুনে! পুরনো চাকরিটাও খতম হতে পারে তো! তার চুপ থাকাই ভালো।

যা মনে মনে চাওয়া গেছল, তা অনায়াসে পেয়ে গেছে পাবতী। পরিতৃপ্তির নাচুনি পার্বতীর সর্বশরীরটাকে নাচিয়ে তুলল। দৌড়ে গেল এ সুসংবাদ পৌঁছে দিতে মা-বাবার কানে—তার প্রিয় কৃষ্ণরাজুর কানে।

পার্বতীর কৃষ্ণরাজুর সঙ্গে নিরিবিলিতে আলাপের আরো সুবিধে হল। রিনিদের কোয়ার্টারের কাজ পেয়ে। প্রতিবেশীদের আড়িপাতা আর লুকিয়ে দেখা থেকে রেহাই পাবে দুজনে।

কৃষ্ণরাজু কাজে যাওয়া আসার পথে—সন্ধ্যে-সকাল কোয়ার্টারে যায়—পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে, একটু দূরে টিলার আড়ালে কথা-বার্তা কয়ে যায়।

দু'জনেরই খুশিমনের হাত ধরাধরি, কোয়ার্টারের সামনে এসে ছাড়াছাড়ি হয়। পার্বতী ঢোকে কোয়ার্টারে—কৃষ্ণরাজু পা বাড়ায় খনিমুখো-ঘরমুখো।

পার্বতী ক্রমে ইঞ্জিনিয়ার সাবের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলল রিনিকে সেতু করে। এত ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল যে, রিনির চেয়ে রিনির বাবাই পার্বতীর সঙ্গে মেশবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠতো।

তখন অত বোঝেনি রিনি। তার ছেলেমানুষি জিদের জন্যে, একটু মনের তৃপ্তির জন্যে, কি সর্বনাশ না করেছিল সে!

পার্বতীরও ঢলা-ঢলি, বাবার গায়ে পড়াপড়ি বেড়ে উঠতে লাগল দিন দিন। যে মার নাম ছিল আনন্দময়ী, সেই মায়ের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল।

খুঁটি-নাটি ব্যাপার নিয়ে বাবা-মার মধ্যে তুলকালাম ঝগড়ার সৃষ্টি হত। অনেক দিন মা চলে যেতে চেয়েছে, অবিশ্যি বাবা ছাড়েনি। ঝগড়া হলেই বাবা খালি বলত—পার্বতীকে নিয়ে সন্দেহ কর। ছিঃ! তোমার কি সংকীর্ণ পাঁকে ভরা মন! মনটাকে বড় করতে চেষ্টা কর! ওকে বুকে তুলে নিতে পার না? আমায় যদি চাও, ওকে বুকে তুলে নাও। তোমার বড় মেয়ের মতো—রিনির চেয়ে আর কত বড় ও?

মা, বাবার একথা কিছুতেই মেনে নিত না।—দোহাই তোমার, বাইরের ছেঁড়া ঝঞ্ঝাট নিয়ে ঘরাঘরি অশান্তি কেন? তুমি অন্য লোক দেখ। ওকে ছুটি দাও। মা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছে।

বাবা সান্ত্বনা দিয়েছে—তুমি কাঁদলে, অস্থির হলে আমার মনোবল, কর্মশক্তি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। নষ্ট হয়ে যাবে। বাবার কথা মুখার্জীর মুখে।

রিনি মাগো-মা বলে অন্তর্ভেদী চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

রিনির পাশে বসা কিংকর্তব্যবিমূঢ় কৃষ্ণেশ অস্থির হয়ে ওঠে—রিনির কি মাথা খারাপ হল?

রিনি, রিনি! হাত ধরে টেনে বসাল কৃষ্ণেশ। দুহাতে ঝাঁকুনি দিয়ে সংবিত ফেরাতে চেষ্টা করল। রিনি চাইল কৃষ্ণেশের চোখের দিকে—সে চোখে টলটল করছে জল—উপচে পড় পড়। কৃষ্ণেশের বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। —ঠিক এই জিনিস, এই চোখের জল তার বাবার চোখেও দেখেছিল। কিন্তু কি হয়েছিল তাতে? বাবা কি ছাড়তে পেরেছিল পার্বতীকে? না।

প্রথম প্রথম পার্বতীর বিষয়ে যে কোনো কথায় বাবা প্রতিবাদ করেছে। রাগ দেখিয়েছে। মাকে ভয়ও দেখিয়েছে—সব ছেড়ে-ছুড়ে বিবাগী হয়ে যাবে। ভয়ে-ময়ে মা পা দুটো জড়িয়ে ধরেছে—
—ওগো ক্ষমা কর। আর বলব না!

কিন্তু এতেও কি শান্তি পেয়েছিল মা?

রিনি কৃষ্ণেশকে ছেড়ে দিল। কান্না-ভেজা গলায় কাতর অনুরোধ

করল—মুখার্জী, প্লিজ! আমাকে একটু একলা থাকতে দাও! নিজেকে সামলাতে দাও?

কৃষ্ণেশের ভয়, রিনির যা অবস্থা, আবার না ফিট হয় শেষে! একলা ছাড়া কি সম্ভব? কিন্তু না ছেড়েও উপায় নেই। তাঁবুর বাইরে বসে লক্ষ্য রাখাই ভালো। কাছে থাকলে আরো অশান্তি বাড়ছে বই কমছে না রিনির। কৃষ্ণেশ বাইরে চলে গেল তাঁবুর।

রিনি আছড়ে পড়ল বিছানায়।

—ঘোরান যায় না, পৃথিবী যে ধারে ঘুরছে তার উল্টো দিকে ঘোরান যায় না। বাবার মনের গতিকে মা ঘোরাতে পারেনি শত চেষ্টাতেও। কেঁদে-কেটে আত্মহত্যা করতে গিয়ে চলে যাবে ভয় দেখিয়ে—কিছুতেই না। মা হার মানল বাবার কাছে।

পার্বতীর শরণাগত হল। সেখানে আরও নির্মম ব্যবহার পেল মা। পার্বতীর কানে লোহার কপাট বন্ধ। মায়ের মাথা কোটা সার হল। দরজা খুলল না। মায়ের আরজির শুনানি হল না। নাকচ হয়ে গেল।

পাহাড়ি পার্বতী, সরল পার্বতীর চোখে হিংস্র নরখাদক লাফিয়ে উঠল। ঝাঁঝাল গলায় বলল পার্বতী—আমি এ জায়গা ছাড়ব না। সবকে ছাড়ব না! কিছুতেই না! তোমার রিনির কি হচ্ছে দেখবার দরকার নেই আমার। কেন চাকরি ছাড়িয়েছিল তখন?

মা অসহায় ভাবে রিনিকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল, রিনির মাথায় মায়ের চোখের জল ঝরে পড়ছিল নিঃশব্দে।

রিনির মনে হয়েছিল সেই উত্তাপ ভরা চোখের জল মাথায় পড়ে বরফ জমা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—মায়ের বুকের তাপ যেন কনকনে ঠাণ্ডা। সেখানে একটা হিমশীতল ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

এরপর। মা একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল। পাথর মূর্তির মতো চুপ-চাপ। বাবার কোনো ব্যাপারেই কথা কইত না। চোখের সামনে পার্বতী-বাবার হাসাহাসি, বুকে পড়া-পড়ি দেখলেও, কোনো রকম বাদ-প্রতিবাদ করত না। উপদেশ—নীতি-কথা শোনাত না।

অনুরোধের তো কথাই ওঠে না।

মায়ের উদাসীন ভাব দেখে দেখে, বাবা নিজেই একদিন বলল —আভা, পার্বতীকে সরালে কি তুমি খুশী হও।

অনেকদিন বাদে মায়ের মুখে আবার হাসি দেখেছিল রিনি! মা বলেছিল—ওর বিয়ে দিয়ে দাও—কৃষ্ণরাজু তো আছে—যা খরচ হয় —গয়নাগাটি বিক্রি করেও যোগাড় করা হবে'খন।

বাবা মায়ের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে, ভীষণ বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠছিল—এত হিংসে ওর ওপর! একটা দুধের শিশুর ওপর? তুমি না মেয়ের মা! তোমাকে ছাড়তে হয় সেও ভি আচ্ছা, তবু ওকে পারব না। এখানে থাকতে গেলে, ওর খোশামোদ করে থাকতে হবে তোমাকে—না পারলে পথ দেখে নাও! অনেক ভেবে-চিন্তে দেখেছি—তোমার সঙ্গে বনি-বনা হওয়া অসম্ভব।

এই সব কথা কাটা-কাটি, দূরে দাঁড়িয়ে বেশ উপভোগ করেছিল পার্বতী। মুখ টিপে টিপে হাসছিল।

রিনি তখনও ব্যাপারটার গুরুত্ব দিতে শেখেনি—ভাবতে শেখেনি। মায়ের চোখে জল, বাবার রক্তচক্ষু দেখে হাসির কাছেই দৌড়ে গেছল রিনি—পার্বতীর কাছে। জড়িয়ে ধরে বলেছিল—পার্বতী বহিন! তুমি এদের থামাও না! ঠাণ্ডা কর না। মাকে আটকাও। বেরিয়ে যাচ্ছে যে!

খেঁকিয়ে উঠেছিল পার্বতী!—ছোড় দে সতী কি বেটী, ভাগ্! হট যাও! হম বদমাশ খারাপ আওরত। মত ছুঁও!

অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয় নিয়ে মায়ের পেছনে আঁচল ধরে দাঁড়িয়েছিল রিনি! তার দু'চোখ থেকে টস্‌টস করে জল ঝরে পড়েছিল অজস্র ধারে।

বাবার চমক ভাঙল রিনির কান্না দেখে, পার্বতীর কথা শুনে। মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল তাকে, বুকে চেপে ধরে বলল, আভা! আমায় ক্ষমা কর! আমি বুঝেছি, কি ভুল করছিলুম! আজ চোখ খুলে গেছে। আমায় ছেড়ে যেও না কোথাও!

মায়ের যাওয়ার মোড় ঘুরে ছিল। ঘরে ঢুকে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়েছিল। বাবা পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিল—আমি যত শিগগির পারি—পার্বতীর বিয়ের ব্যবস্থা করছি।

বাবা ব্যবস্থা করেছিল পার্বতীর বিয়ের। কৃষ্ণরাজুর সঙ্গে বিয়ে হবে ঠিক হয়ে গেল। দু'পক্ষের লোক ফাঁকা মাঠে জমা হল। মাথার ঢেউ উঠছে এদিক ওদিক। অগুনতি লোক সমাবেশ। রঙ-বেরঙের ঘাগরা পাজামা ধুতি শাড়ি পরে এসেছে শাদি দেখতে—ওইতা-ওয়ারা বেগা দেখতে এসেছে। ছেলে-মেয়ের বিয়ের সভা দেখছে বসে বসে পার্বতী-কৃষ্ণরাজুর মা-বাপ।

মা-বাবা রিনিও দেখতে গেছে।

দূর থেকে ঘাগরা-চোলি পরে, মাথায় পর পর পাঁচটা হাঁড়ি নিয়ে, ঠমকে ঠমকে নাচের ভঙ্গিতে এক পা এক পা এগিয়ে আসছে পার্বতী। মাঝখানে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

জমাট লোকের দুলুনি শুরু হয়ে গেল—ভূমিকম্পে কাঁপা কালোজমি নড়ে উঠছে। সকলের চোখে-মুখে উৎসুক-উৎকণ্ঠা ফুটে উঠতে লাগল। একটা চাপা গুঞ্জনে তোলপাড় করতে লাগল সমস্ত মাঠটা।

থমথমে ভাবে রিনির কেমন ভয় ভয় হচ্ছিল। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখে সে, যে ফূর্তি নিয়ে এসেছিল মা, সে ফূর্তি আর নেই। মুখটা শুকনো শুকনো।

মায়ের বুকে মাথা রেখেছিল রিনি। সে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিল মায়ের বুকের ধকধকানিটা। এত তাড়াতাড়ি হচ্ছিল—যেন রিনির কানে রেলচলা আওয়াজ বাজছিল ঘনঘন।

হঠাৎ একটা অমঙ্গলে চিৎকারে ফেটে পড়ল মাঠ।—হায়! হায়!

অবাক বিস্ময়ে এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে আছে শুধু। পাশের লোকটি বলে উঠল—আরে! কৃষ্ণরাজু এরকম বেকুফ বানবে—ছ্যা-ছ্যা! ওকে তীরন্দাজ বলেই সবাই জানে। তীর ছোঁড়ায় ওর

সমকক্ষ কেউ নেই। ছোঁড়ার অব্যর্থ লক্ষ্য!

আশ্চর্য! মাঝের হাঁড়িটায় বিঁধতে পারল না। পাশ কাটিয়ে গেল তীরটা! ব্যাটা বিয়ের আনন্দে খুব টেনে এসেছে নিশ্চয়!

আর কোনোদিন পার্বতীকে ও, আর ওকে পার্বতী বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ের প্রধান নীতকিত্তের অঙ্গ হানি হয়ে গেল।—শেষ!

মায়ের মুখটা কালচে হয়ে গেল। বাবার ঠোঁটের কোণে গোঁফের পেছনে চাপা হাসি ফুটে উঠল। মায়ের পিঠে হাত চাপড়ে বলল, ফেরা যাক—কৃষ্ণরাজুটা অপদার্থ।

পার্বতী কোয়ার্টারে জেঁকে বসল ভালো ভাবেই। এবারে অশান্তি চরমে উঠল। কুমারী মেয়ের মান-ইজ্জত রাখতে বাবা উঠে পড়ে লেগে গেলেন। আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে হবে তো! পার্বতীকে নিয়ে ঘোরা ফেরা চলল—দোষ খণ্ডন করতে গুণী পণ্ডিতদের দরজায় দরজায়।

একদিন শোনা গেল, কোন পণ্ডিত নাকি বলেছে, পার্বতী বাবার পূর্ব জন্মের স্ত্রী। তাই বিবাহ আসর পণ্ড হয়ে গেছে। সেই কারণে স্বামী আর স্ত্রীকে দ্বিচারিণী করতে পারে না—অন্য কারো হাতে তুলে দিতে পারে না! তাই ধর্ম রক্ষা করেছে পার্বতীকে বিয়ে করে।

মা আবার ব্যথা পেলেন খুব। বেশ বুঝতে পারা গেল, এই কথা শোনবার পর থেকে মা অসুস্থ হয়ে পড়ল। বাবার মুখের দিকে ফিরেও চাইত না। মায়ের চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গেছল। চোখ দুটো খাঁ খাঁ করত।

মামাকে সব কথা খুলে লিখল মা—তার কপাল ভেঙেছে। এসে নিয়ে যেতে।

মামা এল।

অনেক বোঝাল বাবাকে—যা হবার হয়ে গেছে—তার তো আর চারা নেই! দুজনে বনিবনা হচ্ছে না যখন—আলাদা আলাদা রাখলে—ভালো হয় না কি?

বাবা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আলাদা ব্যবস্থা করতে নারাজ। হিংসুকে মন নিয়ে আভার থাকা যেতে পারে না এখানে।

অগত্যা মামা মাকে রিনিকে নিয়ে গেল কোরবা ফিল্ড থেকে।

এখন রিনিকেও এই সুরাইবিল ক্রোমাইট ফিল্ড থেকে বুক ভাঙা ব্যথা নিয়ে চলে যেতে হবে তার মায়ের মতো। মায়ের তবু ভাই ছিল—মামা ছিলেন। রিনির কে আছে?

কে আছে? বিছানার ওপর আছাড়ি পিছাড়ি করতে লাগল রিনি।

তাঁবুর পরদার দরজার ধারে অস্থির পায়চারি করছে কৃষ্ণেশ। রিনির কষ্ট সে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে আড়াল থেকে—লুকিয়ে লুকিয়ে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু রিনির বারণ—যাবার উপায় নেই!

রিনি চারপাই থেকে নামল। চারপাইয়ের তলা থেকে স্যুটকেস টেনে বার করল। তালা খুলতে লাগল!

রিনি যেন কি বার করছে—লুকিয়ে কোনো বিষাক্ত জিনিস রেখেছে নাকি? আত্মহত্যা করবার বুদ্ধি হল শেষে!

কৃষ্ণেশ দ্রুত পায়ে রিনির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। রিনি ফটো দেখছে—তার মা, মামা আর ছোটো রিনি। আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেল কৃষ্ণেশ।

কৃষ্ণেশ তাঁবুর ভেতর ঢুকছে—রিনির পেছনে দাঁড়িয়ে ফটো দেখছে, কোনো খেয়ালই নেই তার—এত তন্ময় হয়ে মাকে দেখছে সে—মামাকে দেখছে।

ফটোছটো নিয়ে রিনি মাথায় ঠেকাল। চারপাইয়ে নিয়ে এল। মাথার বালিশের ওপর শুইয়ে দিয়ে বারবার দেখতে লাগল নিবিষ্ট মনে।

কৃষ্ণেশ বাইরে মোড়ায় বসে রইল। রিনি তো নিজেই বলেছে—সামলাতে দাও! ও সামলাক। তারপর—ওর মায়ের জীবনটা বড় করুণ! বিয়ের আগে রিনি সব তাকে জানিয়েছিল। রিনি, জ্ঞান হবার পর থেকে, বুঝতে শেখবার পর থেকে—আঘাতের পর থেকে, বুঝতে শেখবার পর থেকে—আঘাতের পর আঘাত পেয়ে আসছে এক এক করে! কৃষ্ণেশের মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠতে লাগল।

রিনির বাবার মৃত্যুটাও খুব ভালো নয়। রিনিকে—রিনির মাকে তাড়িয়ে দিল রিনির বাবা। অভিমানী রিনির মা এক কাপড়ে বেরিয়ে এল মেয়ের হাত ধরে, ভাইয়ের সঙ্গে।

মেয়েকে রাখতে চেয়েছিল বাবা। মা রাখতে চায়নি। বাপের ধর্ম—কর্তব্যের খাতিরে একবার বলেই খালাস—দ্বিতীয়বার মুখ খোলেনি।

যাবার সময় বাপকে প্রণাম করতে গেলে—পায়ের ধুলো নেবার সময় বাপ খোঁচা দিয়ে বলেছিল, খাওারনি মায়ের কাছে কষ্ট পেলে—চিঠি দিও, লোক পাঠাব নিয়ে আসতে।

মায়ের সঙ্গে বাবাকে দিনরাত অশান্তি করতে দেখে দেখে, রিনির মন বিষিয়ে গেছল বাবার ওপর। শেষের কথা শুনে মনে হয়েছিল তার—বাবাকে আমার কেড়ে নিল ওই পার্বতী মুখপুড়িটা! আমাদের তাড়িয়ে দিল—মাকে আর বাবা নিয়ে আসবেন না! তাকে আনাবে বলল—কিন্তু মাকে না।

স্টেশনে কৃষ্ণরাজুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল মায়ের মামার। ও শুনেছিল রিনিরা চলে যাচ্ছে—দেখা করতে এসেছিল তাই। কথা কইবার কিই-ই বা ছিল কৃষ্ণরাজুর সঙ্গে। মা দুঃখ-বেদনা ভরা মুখেও তাকে দেখে, সৌজন্যের—বংশগত অভ্যাসের হাসি

হেসেছিল। বলেছিল, তোদের দুশমন এসেছিলুম রাজু! চলে গেলুম—কিছু মনে করিস না। মায়ের কথাগুলোও হয়ে গেছল—বলতে হয় কিছু, তাই বলে যাচ্ছে—প্রাণ ছিল না তাতে। সজীবতা ছিল না—আগেকার ছবিটা পরের জীবনে এইভাবে—এই মানে নিয়ে ফুটে উঠেছিল রক্তরাঙা আগুন হয়ে—সে আগুন যখন জ্বালিয়ে মারছে কারণে-অকারণে।

বিয়ের আগে দুবছরের ভেতর মাঝে মাঝে রিনি তার আত্মকাহিনী শোনাত কৃষ্ণেশকে। কৃষ্ণেশ শুনত দুনিয়া ভুলে গিয়ে। তার হৃৎপিণ্ড নিংড়ে চোখ ছল-ছলিয়ে উঠত রক্ত-জলে।

সত্যিই রিনির বাপ নিজের ভুলে অঘোরে মারা গেল।

কৃষ্ণরাজু বলেছিল মাঁকে—সাবই তাকে অনেক টাকা দিয়ে, সেদিন তীর ছুঁড়তে দেন নি ঠিক জায়গায়। উনি বলেছিলেন—তুই হেরে গেলে আমি তোকে সব দিয়ে যাব—আমার যা কিছু ধন-সম্পত্তি, বিষয়-আশয়। পার্বতী, তুই সারা জীবন বসে বসে খাবি।

পার্বতীর সঙ্গে তোর প্রেম-ভালোবাসা থাকুক, তাতে ক্ষতি নেই। রোজ আসবি এখানে। বিয়ে হলে তো সেটা হবে না। তোদের ঘরে থাকতে হবে ওকে—সমাজের খাতিরে। আমি বাঁচব না তাহলে। কৃষ্ণরাজু সাবের কান্না দেখে, হাত ধরায় ভুলে গেছল। এত বড় মানী লোক—মেয়ের মতো কত স্নেহ করে! সরল প্রাণে সে সব মেনে নিয়েছিল। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সাবকে—হ্যাঁ, সে সাবের কথা মতোই কাজ করবে। সাব আনন্দে পকেট থেকে একশো টাকার নোট এক-কেতা তাকে ইনাম দিয়েছিল।

পরে যখন শুনল কৃষ্ণরাজু, পার্বতীর সঙ্গে সাবের বিয়ে হয়ে গেছে—তখন মনে হয়েছিল—সাব এত চতুর! তার সরল প্রাণে দাগা দিল—খুন করে ফেলবে।

সাব নিজে ডাকিয়েই বলেছিলেন—কানাঘুষো শুনছিস কিছু? বিয়ে-থা? ওসব বাজে! পাছে কেউ অপযশ দেয়, তাই এটা রটিয়ে দিয়েছি। তুই-পার্বতী ঠিক থাকলেই হল! আর একখানা একশো

টাকার নোট দিলেন সাব সেদিনও।

সমস্ত জানিয়ে কৃষ্ণরাজু বলেছিল মাকে ফিরে যেতে। সাব তাকে খুব ভালোবাসেন। তার কথা নিশ্চয়ই শুনবেন। সে সব বুঝিয়ে বলবে—মাকে রাখতে—এটা অন্যায় হচ্ছে।

কোনো কথায়ই কান দেয়নি মা, ট্রেন এসে দাঁড়াতে রিনিকে নিয়ে উঠে বসে কৃষ্ণরাজুকে বললে—তোকে আমার মনে থাকবে রে রাজু!

মামা ট্রেনে আপসোস করে বলেছিল মাকে—আভা! বিলিতি ডিগ্রির মোহে শয়তানের হাতে ফেলে দিয়েছিলুম তোকে। কি বিষম চক্রান্ত! নিজের তৃপ্তির জন্যে তোদের দুজনকে যে মেরে ফেলেনি এই—যথেষ্ট!

আমি যতক্ষণ আছি তোর—আর তোর মেয়ের জন্যে ভাবিস না!

রিনি কৃষ্ণেশের মায়ের কাছেও এসবই বলেছিল। তার অতীত ইতিহাস। মা শুনে কেঁদে ফেলেছিল। রিনির পিঠে হাত চাপড়ে বুঝিয়েছিল। রিনিকে থেমে যেতে দেখে বলেছিল কৃষ্ণেশের মা—তোমার বাবার কাছে না হয় যাক না একবার কৃষ্ণেশ: হয়ে গেছে অনেক দিন। এখন মনের পরিবর্তন হতে পারে তো? যতই হক, রক্তের টান বলে তো একটা কথা আছে!

নার্সিং হোমের নার্স এসে কৃষ্ণেশের মাকে—কাঁদতে, কথা কইতে বারণ করল। হাই প্রেসার একে—। অ্যাডেলফিন ট্যাবলেটটা খাইয়ে চলে গেল নার্স।

রিনিকে অনুরোধ করল কৃষ্ণেশের মা।—ত্যাখো! আমার কথায় রাজি?

রিনি ধরা গলায় বলল—বাবা মারা গেছে—শুনেছি—ওখানকার ডাকাতরা খুন করে ফেলেছে—

পার্বতী কোথায়?

—পার্বতী-কৃষ্ণরাজু একটা বাড়িতে থাকে। বাবাই করে দিয়েছিল ওদের। ওদের দুজনের বিয়ে হয়েছে এখন।

—মা কি একথা শুনে মারা যান, না আগে ?

—শোনার পর। মা দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল। খালি বলত—ওকে মেরে ফেলল—ওই ছুঁড়ি-ছোঁড়া মিলে—ডাকাত-টাকাত সব বাজে। বাড়ি বাগিয়ে নিয়ে শেষ করে দিল মানুষটাকে! আহা! কথা শুনল না! মোহে পড়ে গিয়ে অঘোরে প্রাণটা দিল বিদেশে—মরবে বলে কোনো কথাই কানে যেত না। সব উল্টো বুঝত। নিয়তি টেনেছিল ওকে।

বাবার এইভাবে মৃত্যুর পর মা দারুণ আঘাত পায়। ক্রমশ শরীর ভাঙতে থাকে। ডাক্তার-বদ্যি অনেক দেখান হয়েছে। কোনো কাজ হয় নি। লিভার শুকিয়ে গেছল। মাস কয়েক ভোগার পর মারা যায়।

সেই মায়ের ফটো নিয়ে রিনি কি এত দেখছ? ওর পূর্বস্মৃতি নিয়ে বেশিক্ষণ নাড়াচাড়া করলে ফিট হয়ে যাবে!

কৃষ্ণেশ ভেতরে ঢুকল। আবার স্নেহ-স্নিগ্ধ গলায় বলল—রিনি! চুপ কর! শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে!

—রিনি চুপ কর, শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে—একথা রিনি যখন নার্সিং হোমে থাকত, তখন অনেকবার শুনেছে। কিন্তু আজকের বলার ভঙ্গিমা যেন ছুঁচ বেঁধানর জন্যে মনে হচ্ছে রিনির। তখন রিনি কৃষ্ণেশের প্রত্যেক কথাকটি যে স্নেহ উপচে পড়া, এটা বেশ অনুভব করত। কিন্তু আজ, কৃষ্ণেশ যা কিছু বলেছে তাকে শান্ত করবার জন্যে—সান্ত্বনা দেবার জন্যে—সবেতেই সে অতীতের সঙ্গে একটা গরমিল খুঁজে পাচ্ছে। কেবল মিল এক জায়গায় স্পষ্ট, তার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে ভেসে উঠছে বারে বারে—তার বাবার চরিত্রে কৃষ্ণেশের অভিনয়—পার্বতীর জায়গায় সাঁওলী—নামের হেরফের খাল। রিনির অবস্থা? হুবহু তার মা আভারানী! মায়ের অদৃষ্ট তার বরাতে জেঁকে বসেছে!

মায়ের অদৃষ্টের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে রিনি জড়িত—সে অদৃষ্টের

প্রভাবে রিনি হাবুডুবু খাচ্ছে এখনো। রিনি শিউরে উঠল। অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

নিজের অজান্তেই ভয় পাওয়া করুণ আর্তনাদ করে উঠল—মুখার্জী —মুখার্জী।

কৃষ্ণেশ রিনিকে নিবিড় করে বুকে চেপে ধরে রয়েছে—ভয় কি, রিনি! আমি তোমার কাছে—এই যে।

রিনির চাউনি শূন্যে আটকে গেছে—স্থির দৃষ্টি। অন্ধের মতো হাতড়াতে লাগল এপাশ-ওপাশ।

—কি খুঁজছ রিনি?

রিনি হাঁপাতে লাগল—মুখার্জী, পালিয়ে চল—ওরা খুন করে ফেলবে তোমায়।

—রিনি, তুমি শান্ত হও। তোমাকে নিয়েই পালিয়ে যাব।

ক্লান্ত স্বরে জড়ান জড়ান গলায় রিনি বলল, সত্যি—সত্যি।

কৃষ্ণেশের বুকের ওপর মুখ গুঁজে গড়িয়ে পড়ল বেহুঁশ রিনি।

রিনির ফিট হওয়ায় বিব্রত হয়ে পড়ল কৃষ্ণেশ। মাথায় মুখে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে স্মেলিংসল্ট শুঁকিয়ে, মিনিট দশেক ধরে, মানসিক উদ্বেগ নিয়ে কাটাল। মিনিট দশ পর রিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল —জমাট ব্যথা খালি করা নিঃশ্বাস। রিনি চেতনা ফিরে পেল।

রিনিকে উঠতে—কথা কইতে দিল না কৃষ্ণেশ। মাথায় হাত বুলোতে লাগল ঘুম পাড়াবার জন্যে।

রিনির চোখে ঘুম নেই। খালি ছটফট করছে। এত দিন মুখার্জীকে নিয়ে সে সব ভুলেছিল। আজ অতীত তাকে পেয়ে

বসেছে। বড় জ্বালাচ্ছে। কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। এক এক করে দুঃখের চাবুক মারছে। ভেতর পিঠে রক্ত ছুটেছে—জ্বলে উঠেছে—সহ্য করতে পারছে না।

কৃষ্ণেশের মুখের দিকে চেয়ে রিনির মনে পড়ছে নার্সিং হোমের ঘটনা—মামার বাড়ির কথা—কৃষ্ণেশের সঙ্গে পরিচয় বিয়ে—অপবাদ—

রিনির মা মরে যাবার পর, তাকে বুকে করে মানুষ করেছে মামা। মামা অকৃপণ স্নেহ ঢেলে দিয়েছে রিনিকে গড়ে তুলতে। মা-বাবার শূন্য স্থান কোনোদিন খালি লাগেনি রিনির কাছে স্রেফ মামার জন্যে।

রিনি বড় হতে লাগল। লেখাপড়া শিখতে লাগল। ম্যাট্রিক, আই. এ, বি. এ, পাশ করল।

বি. এ পাশের আনন্দ বেশিদিন ভোগ করতে হল না রিনিকে। এম. এ পড়ার ইচ্ছেয় ছেদ পড়ল। রিনির বাঁ পায়ে দারুণ যন্ত্রণা আরম্ভ হল—রাতে দিনে ঘুম নেই চোখে। সে একদিন গেছে! এখনো মনে পড়লে বাঁ পাটা শিরশির করে ওঠে। চলতে গেলে দুমড়ে পড়ে।

সেদিনকার যন্ত্রণা-কাতর রাত কটায়, মামা কাছে না থাকলে রিনি আত্মহত্যা করে ফেলত—এই রকম মনের ভাব এসে গেছল। রিনির পায়ের ভেতর অহর্নিশ বরফ—কনকনানি যন্ত্রণায় ইরগাপাইরিন ইনজেকশান দিয়ে দিয়ে ঘুম পড়ান হত।

ভোরে ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখত রিনি, মামার ক্লান্ত রাত জাগা চোখ দুটোর অপলক দৃষ্টি তার চোখে। করুণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করত মামা—রিনি! এখন কেমন? কষ্ট হচ্ছে? মামার মুখ দেখে মনে হয়েছে, রিনির সায়েটিকা পেইন মামাই বোধহয় সারারাত ভোগ করেছে আকর্ষণ করে নিয়ে, তাকে সুস্থ রাখবার জন্যে। নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে ঘুম পাড়াবার জন্যে মামা যেন নিজেকে দিন দিন নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

বড় কষ্ট হত মামাকে দেখে। রিনি বলত—মামা! তোমার

শরীর বড্ড ভেঙে পড়ছে। নিজের দিকে একটু লক্ষ্য রাখ। অসুস্থ হয়ে পড়লে—

রিনি আর বলতে পারেনি। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মামা চিবুক ধরে আদর করে বলেছে—পাগলি কোথাকার! আবার কাঁদে! আমি মরব নারে! তোর কোনো ভয় নেই!

রিনি যে ভুক্তভোগী। ভয় নেই বললেই কি ভয় যায়? অল্প বয়সেই পরপর দুটো ঘা খেল। সে ঘা মর্মান্তিক। বাবা মার মৃত্যু! রিনির এখন একমাত্র সহায় সম্বল মামা। সেও তার বরাতে টিকলে হয়! তার ওপর খোঁড়া হওয়া রোগ ধরলে তাকে। নিজে চলে ফিরে স্বাধীন ভাবে কিছু করবার ক্ষমতা, লোপ পেতে বসেছে তার।

রিনি চারধার শূন্য অন্ধকার দেখে। তার চোখে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দুঃস্বপ্নের ছায়া ঘিরে আসে।

রিনি মামার ঘাড়ে চিরদিন ভার বোঝা হয়ে থাকতে চায়নি কোনোদিন। পরিস্থিতি তাকে পরাধীন করে রেখেছিল। মামার ভার লাঘব করতে চেয়েছিল সে—ছাত্রী পড়িয়ে। মামা অরাজি হল। আমি বেঁচে থাকতে নয়! তবুও রিনিকে বিবেকের বৃশ্চিক দংশন জ্বালাত বারে বারে। একটা মানুষের ওপব বিরাট সংসারেব চাপ। তার নিজের শরম আসত। মামাতো ভাই দুটোও মানুষ নয়। বাপের পয়সা ওড়াবে। টো টো করে ঘুরে বেড়াবে রোদে জলে দিনরাত। তাতে কোনো বেজার নেই। যত ঝামেলা কাজের বেলা।

মামার কিছু বলবার জো ছিল না ছেলেদের। মামি ঝাঁপিয়ে পড়বে অমনি শাসনের মাঝখানে। ছেলেদের প্রশ্রয় দেবে আরো। বুড়ি থুবড়িকে ঘরে রেখে লেখাপড়া শেখান—খাওয়ান—এতে খরচ হয় না? যত দোষ ছেলেদের—

জোঁকের মুখে নুন পড়ে যেত একেবারে। মামার মুখ সেলাই হয়ে যেত। আর সেলাইয়ের ছুঁচ হত সে—সেই উপলক্ষ্য।

এইসব ব্যাপার নিয়ে ভালো লাগত না রিনির মামার বাড়িতে থাকতে—খেতে। কিন্তু মামার মুখ চেয়ে তার নড়বারও উপায় ছিল না।

সায়েটিকার পেইনে ভোগবার সময় সেই উত্থানশক্তি রহিত অবস্থায় মামি চরম অস্ত্র হানল। সে অস্ত্রে রক্ত বেরুল না, কিন্তু তার সর্ব শরীরের রক্ত শুষে নিল। এখনো মনে পড়লে রিনির সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। হৃৎপিণ্ডের চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম হয়।

রিনি হাঁপিয়ে উঠল। তার দম আটকান ভাবে কৃষ্ণেশ ভয় পেয়ে গেল। ভীতি বিহ্বল কণ্ঠে ডাকল কৃষ্ণেশ—রিনি! রিনি!

রিনি থেমে থেমে বলল—মুখার্জী! তুমি, কেন আমার সঙ্গে যন্ত্রণা ভোগ করছ? একটু বাইরে বস! আমাকে একলা থাকতে দাও খানিক! এত অনুরোধ করছি, শুনছ না কেন?

সত্যিই, তার উপস্থিতি রিনিকে শান্তি দিতে পারছে না মোটে। রিনি বিরক্ত হচ্ছে—অসোয়াস্তি ভোগ করছে! কৃষ্ণেশ বিমর্ষ মুখে, অনিচ্ছাসত্ত্বও বেরিয়ে গেল।

রিনির মনে স্মৃতির কালবৈশাখীর আগুন শুরু হল দ্বিগুণ ভাবে। কানে আঙুল দিয়ে চেপে ধরলে প্রাণপণে—তার মনের কথা বাইরের কানেও সজোরে আঘাত করছে যেন। শুনতে চাইছে না রিনি।

জোর করে শোনাচ্ছে তাকে মামি।

—দুজনে মামা-ভাগ্নী মুখোমুখি হয়ে বসে থাকলেই চলবে নাকি! সংসার উচ্ছন্নে যাচ্ছে, সেদিকে যে খেয়াল নেই কোনো। বলি, আমার চোখে না হয় হাত চাপা দিলে নানা রকম ন্যাকামি করে—ধমকে-ধামকে মুখ বন্ধ করলে—পাড়াপ্রতিবেশীর চোখ-মুখ?

বজ্রাহতের মতো চমকে উঠেছিল রিনি। তার ঠোঁট দুটো নড়েই থেমে গেছল। কথা কইতে পারেনি। বলতে পারেনি—মামিমা! একি বলছ তুমি? আমি চলে যাচ্ছি—মামাকে রেহাই দাও!

মামা মুখ চাপা দিয়েছিল মামির—ছিঃ ছিঃ, কি বলছ তুমি! মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।

মামার হাতটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে মামি ভীষণ চিৎকার করে উঠেছিল—মামা-ভাগ্নীর প্রেম করতে দোষ নেই আমার বলতেই যত দোষ! আমায় পাগল সাজান! কেন? পাশের বাড়ির মাদ্রাজী বৌয়ের মুখে তো সেদিন শুনলুম, মামা-ভাগ্নীর বিয়ে নাকি কুলীন বিয়ে। ওদের দেশে সম্ভ্রান্ত ঘরে হয়! সেই শুনে অবধি আমার মাথায় ঘুরছে—এ কাণ্ড তো আমার ঘরেই চলছে। সায়েটিকা বাত যেন আর কারো হয় না! ছ্যাঃ—ঘেন্নায় মরি! বেল্লিকপনার চেয়ে, বিয়ে করে ফেললেই তো সব ল্যাটা চুকে যায়। আমি বরণ করব'খন দুজনকে!

পা ছড়িয়ে মরাকান্না সুরু করে দিয়েছিল মামি। আশে পাশের বাড়ির খড়খড়ি তোলা চোখগুলোর কৌতূহলী দৃষ্টি ছেয়ে গেছল মামার বাড়ির চাদিকে।

রিনির দরকার নেই আর থেকে—এক মুহূর্ত নয়। মামির অসম্ভব কথার ঘায়ের অসহ্য ব্যথা তার সায়েটিকার যন্ত্রণাকেও হার মানিয়েছে। রিনি নিজের সামর্থ ভুলে গিয়ে, অবশ পায়ের কথা ভুলে গিয়ে. খাট থেকে নামতে গেল আগেকার স্বাভাবিক অবস্থার মতো। বাঁ-পা মুচড়ে আছড়ে পড়ল মেঝেয়।

মামির কথায় মামা কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতবাক হয়ে গেছল। রিনির পড়ার শব্দে সংবিত ফিরে পেল।

কাছে এসে তুলে ধরল রিনিকে। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ধরা গলায় ফিসফিসিয়ে বলেছিল মামা, যাচ্ছিস কোথা? মামিকে তো জানিস! আমি তোকে নার্সিং হোমে রাখবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি—ভাবিস্না!

মামার সজল চোখ দুটো দেখে মায়ের চোখের কথাই মনে হয়েছিল রিনির। তার মরা মা-ই এসে বলছে যেন। রিনি আচ্ছন্নের মতো ঘাড় নেড়েছিল। সম্মতি জানিয়েছিল।

নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিল রিনি। মামাই টাকা দিয়ে ভর্তি করে গেছল। রিনি মামার হাত ধরে অনুরোধ করেছিল, মামা তোমার অপমান আমি সহ্য করতে পারব না। তুমি এখানে আসা-যাওয়া করলে অনর্থ করবে মামিমা। এখানেও আসবে —মামিমার অনেক চর আছে, ওর আপন ভায়েরাই। তার চেয়ে অন্য জায়গা থেকে ফোন করে জেনে নিও খবর। মামা রাজি হয়েছিল রিনির কথায়। ক্ষত-বিক্ষত মন আর বাড়তি কেলেংকারিতে ভর্তি করতে চায়নি।

নার্সিংহোমে মাস দুয়েক কাটল রিনির। মামা লুকিয়ে এসে মাসের টাকাটা জমা দিয়ে যেতো ঠিক।

সামনের খাটে হাই ব্লাড-প্রেসারের রুগী তখন মুখার্জীর মা।

মুখার্জীর মা, রিনির দিকে শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি তুলে ধরে চেয়ে থাকত রোজই।

রিনি সেই সবে এসেছে। মাত্র পাঁচদিন হয়েছে। রিনি বুঝতে পারত মুখার্জীর মা তার সঙ্গে কথা কইতে চায়, গল্প-গুজব করতে চায়, রিনির বুক ঢিব ঢিব করে উঠত—কি পরিচয় দেবে সে নিজের? বাপের—মামির? শুনলে তাকে ঘৃণা করবেন না ভদ্রমহিলা?

রিনি মুখার্জীর মায়ের চাউনিকে এড়িয়ে যেতে চাইত অনবরত। মুখ গুঁজে পেছন ফিরে শুয়ে থাকত। একখানা ঘরে দুজনে এরকম মুখ বন্ধ করে থাকাই বা কদিন যায়? রিনির মনে হত, কেন সে বোবা হয়ে জন্মায় নি? তাহলে তার কোনো দুশ্চিন্তাই আসত না মাথায়!

রোজ বিকেলে আসত অনেক আত্মীয়-স্বজন মুখার্জীর মায়ের কাছে। নিয়ম করে আসত ওরা। ওদের মন প্রাণ কেমন করে তার জন্যে! কারো রাতে চোখে ঘুম নেই, দিনে আর কাজ নেই, শুধু তাকেই দেখছে—তার কথা ভাবছে। কেউ আবার রাতের দুঃস্বপ্নে কেঁদে সারা হয়েছে। দরদীদের মুখের বিরাম নেই, বকবকানিরও শেষ নেই, যতক্ষণ তার কাছে বসে থাকত।

মাঝে মাঝে দু-একজন টিপ্পনী কাটত। ঠানদি, ঠাকুমার বয়সী স্ত্রীলোক—বলি ও দিদি, কদিন তো আসছি, ওপাশের মেয়েটিকে এপাশে চাইতে দেখি না কেন? আত্মীয় স্বজন কেউ আসে না ওর?

রিনি জোর করে চোখের তারা দু'টাকে ভেতরে টানতে চেষ্টা করেছে—যাতে পাতা খুলে না চেয়ে ফেলে। ধরিত্রী তুমি দু'ফাঁক হও—সীতার মতো তলিয়ে যাই পাতালে।

রিনির কানে গেল, কে যেন বলল—খারাপ রোগটোগ নয়ত? কেউ দেখতেও আসে না? দিদির এ রকমটা ছেড়ে দেওয়া উচিত।

শিউরে উঠেছিল রিনি। এখনো তার পায়ে জোর পায় নি। ম্যাক্রাবিন ইনজেকশান আরম্ভ হয়েছে। এর মধ্যে যদি খারাপ অসুখ ঘটে যায়, তাহলে এখানে টেকা দায় হবে। কোথায় যাবে—কেমন করে যাবে এই অসমর্থ অবস্থায়? তার দুর্ভাগ্যের মেয়াদ কি ফুরবে না কখনো? একি চির-জীবনের সাথী তার?

রিনির কানে গম্ভীর-মধুর পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল।—ওরকম যা তা বল না দিদা! কত ব্যথা পাবেন উনি, তা তুমি জান? ছিঃ—

—ছিঃ! রিনি নিজের কানকে অবিশ্বাস করেছিল। তার ব্যথা লাগবে, তাতে অন্যের কি আসে যায়! তার হয়ে অন্যজনে আর একজনকে ধিক্কার দিচ্ছে! রিনির চোখ ফেটে জল আসতে লাগল, সবাই তার বাবা-মামি নয়! মানুষ আছে দুনিয়ার এখনো! দিনরাত পায়ের অসহ্য যন্ত্রণায় আশ্রয়হীন দুনিয়ায়, যে রিনি দিনরাত মৃত্যু কামনা করত—সে রিনির মনে মনে গেয়ে উঠল আর এক অজানা মন—'মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান'। কবিগুরুর গানের কলিটি মৃত্যুকে ভালোবাসতে শিখিয়েছিল সেই মুহূর্তে।

সুখ স্বপ্ন দেখেছিল রিনি। তার শিয়রে যেন কে এসে দাঁড়াল। একটু আগে কথা কওয়া গলা সহানুভূতির নিম্নস্বরে বলল—ক্ষমা করুন। দিদা সেকেলেপন্থী—কথাবার্তার ধরন-ধারণ নিজেও বোঝে নি। আপনি কাঁদবেন না।

শিক্ষিতা রিনি, ভদ্র রিনির মনে হয়েছিল, বলতে বলে। কিন্তু

পারেনি—তার মামির কথা মনে পড়তে মাথা ঘুরে গেছল। মনের কথা মনেই রয়ে গেছল।

ঘরসুদ্ধ একটা নিস্তব্ধতার আবরণে ঢেকে গেল। আগন্তুকরা এক এক করে চলে গেল। রিনি বেশ বুঝতে পেরেছিল তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিও চলে যাচ্ছে। যাবার সময় বলে গেছে—মা ওঁকে অন্য সময় বুঝিয়ে বল! কিছু মনে যেন না করেন! বড্ড আঘাত পেয়েছেন মনে হয়। কাঁদছেন। চোখ চাওয়া অবস্থায়ই লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। কিন্তু রিনির বিচিত্র জীবনে সবই বিচিত্র! মুখার্জীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়—অন্ধ বোবার পরিচয়ের মতো—চোখ বন্ধ—মুখ বন্ধ।

রিনি বোঝে নি তখন। চোখ বুজে, কেবল কথা শুনেই ভেবেছিল—তার কাছে কোন দেবদূত এসে হাজির হয়েছে—দেবদূতের সব জ্বালা জুড়নো বাণী শুনছে সে! আজ সে ভুল ভেঙেছে। সে স্বপ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মুখার্জীর ওই ছদ্মবেশের ভেতর এত শঠতা লুকিয়ে আছে? এতো বীভৎসতায় ভরা নরকের কীট কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কি ভুল করেছে রিনি? কি দুর্ভাগ্য মা-মেয়ের! এক ছাঁচে গড়া। মুখার্জী একেবারে বাবার দ্বিতীয় সংস্করণ।

মায়ের জীবনী দেখে-শুনে-জেনেও সেই ফাঁদে পা দিল রিনি—অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস!

—কি ধূর্ত মুখার্জী! কি ভাবে তাকে মনের মতো কথা কয়ে নিজের কবজায় নিয়ে এল—ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

—মাকে দেখতে এসে, প্রতিদিনই 'রিনি কেমন আছে' জিজ্ঞেস করত মুখার্জী। এইটুকুই যথেষ্ট ছিল তখন তার পক্ষে। রিনি এতেই মুখার্জীকে অতি আপনার জন ভেবে নিয়েছিল। নিজের অগোচরেই মুখার্জীকে ভালো লেগে গেছল।

মুখার্জীর আসবার সময় পেরিয়ে গেলে অস্থির হয়ে উঠত। মুখার্জীর মায়ের কাছে কথায় কথায় বাবার কথা বলেছিল সব। গোপন করেনি কিছু। মামার স্নেহের কথাও। কিন্তু মামির কথা

চেপে গেছল। যাই হক, মামি তো—নীচ মনের কথা বলে ছোট করা উচিত হবে না।

মুখার্জীকে বলেছিল রিনি, মামাকে সে বারণ করেছে আসতে—নানান ঝঞ্ঝাটে থাকে। একটা যদি মেয়ে পড়ান চাকরি পায় তো খুব ভালো হয়। পরাধীন জীবনে তার বিতৃষ্ণা এসে গেছে—হতাশা এসে গেছে।

মুখার্জীর মা মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, ভয় কি? আমরা তো রয়েছি। কৃষ্ণেশ আছে।

মুখার্জীর সেদিনকার ব্যবহার মনে পড়লে আজও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে রিনি। একি অভিনয় ছিল ওর? এত হৃদয়স্পর্শী প্রাণ ঢালা অভিনয়ও হয়? রিনির কেউ আসবার নেই, দেখবার নেই, জানবার পর থেকে মুখার্জী, মায়ের ফলের সঙ্গে আলাদা করে রিনির ফলও আনত রোজ। বারণ শুনত না। রিনির কাছে, মায়ের কাছে যখন তার সমস্ত জীবনী শুনেছিল মুখার্জী, তখন মুখার্জীর চোখ দুটো লাল হয়ে জলে ভরে উঠেছিল। মায়ের সামনে রিনির হাত দুটো ধরে সেই প্রথম নাম ধরে, তুমি বলে ডেকেছিল! রিনি, কোনোদিন কিছু ভাববে না—অভাব-অভিযোগ নিঃসংকোচে জানাবে! আর আপনি না বলে তুমি বলা শুরু কর আজ থেকে। আপনি বড় দূরে সরিয়ে রাখে।

নার্সিং হোমের বারান্দায় প্রতিদিন দশ পনের মিনিট করে হাত ধরে চলা অভ্যাস করাত। কত যত্ন করে মুখার্জী, সে সময় ও ভাবে না করলে, রিনির চলার শক্তি হারিয়ে পঙ্গু হয়ে যেতে হত। মুখার্জীর হাসি-কথা-যত্ন সহানুভূতি—সব মিলিয়ে তাকে নতুন করে বাঁচবার প্রেরণা জুগিয়েছিল। তাই এখন মনে হয়, এভাবে বাঁচিয়ে আজ দগ্ধে দগ্ধে মারা কেন? নিজে হাতে রাইফেলের গুলি চালিয়ে দিক মুখার্জী রিনির বুকে। মুখার্জীর অশান্তির কাঁটা নির্মূল হোক। রিনিরও জ্বালা জুড়োক।

মুখার্জী ছাড়লেও মুখার্জীর অতীত রিনিকে ছাড়বে না কিছুতেই।

সেই অতীত থেকে বাঁচতে গেলে মৃত্যু ছাড়া পথ নেই।

মুখার্জীর মা দেবী। তুলনা হয় না। এরকম স্ত্রীলোক রিনির নজরে পড়েনি।

রিনির দুঃখে দুঃখী। সমব্যথী। কন্যা স্নেহে বুকে টেনে নিয়েছিল। নিরাশ্রয় অবস্থায় রিনিকে আশ্রয় দিয়েছিল নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে।

জাত-বেজাত-সমাজ—বর্ধিষ্ণু ঘরের আভিজাত্য-ইজ্জতের পরোয়া করেনি। জ্ঞাতি-স্বজনের বিরুদ্ধে একলাই দাঁড়িয়ে ছিল ছেলের বিয়ে নিয়ে। মুখার্জীও মায়ের মতে সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিল।

রিনি বিয়ে করতে চায়নি প্রথমে! মুখার্জীকে অনুরোধ করেছিল, আমায় বিয়ে করলে সুখী হবে না। এত লোকের অমত—অশুভ ইচ্ছার ফল খুব ভালো হবে কি? তাছাড়া সে অক্ষম—শোনা যায় সায়েটিকা পোষা রোগ, সুযোগ পেলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে পায়ের চলার শক্তি একেবারে হারিয়ে যেতে পারে। সুতরাং—বাধা দিয়ে, মুখে হাত চেপে ধরে বলেছিল মুখার্জী, রিনু সব জেনে শুনেই তো করছি—এটা আমার দায়িত্ব! আমার অধীনে তুমি—ও নিয়ে দু'মনা করবে না মোটে।

বিয়ে হয়ে গেল নির্বিঘ্নে। বিপক্ষদের কথা ঠেলে অগ্রাহ্য করে।

রিনির নসিব নেমে এল কালো মেঘের ঘনঘটা। কদিন যেতে না যেতেই মামির চিঠি এল মুখার্জীর মায়ের কাছে। মামি ইনিয়ে বিনিয়ে রঙ চড়িয়ে লিখেছে। রিনির সুখ সহ্য হয়নি তার।—এরকম মেয়ের ওরকম ঘরে বিয়ে হওয়া ঠিক হয় নি। মামি শুনে অবধি খাওয়া ত্যাগ করেছে। এক বনেদী ঘরের ইজ্জত যাওয়া মানে—সবার যাওয়া। অন্তত খোঁজখবর নেওয়াটা উচিত ছিল খুব। মামার সঙ্গে যা ব্যাপার—পাড়া প্রতিবেশীর আর জানতে বাকি নেই কিছু—

মুখার্জীর মা' ডেকে বলেছিল—বৌমা, অন্তত এ বিশ্বাসটা ছিল আমার—কোনো কথা গোপন করনি। চিঠিখানা মুখের ওপর তুলে ধরেছিল, পড়ে দেখ। তোমার মামিমা—

রিনির চোখে চিঠির হরফগুলো আগুনের ফুলকি হয়ে ছিটকে আসছিল। সর্বশরীর থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছিল।

মুখার্জী, মায়ের কাছে সব শুনে, চিঠি পড়ে, একখানা থমথমে মুখ নিয়ে রিনির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

উত্তেজনা ফেটে পড়া গলায় বলেছিল, ছিঃ। রিনি, এটা জানাও নি কেন? তোমাকে যখন নিয়েছি, এটা জানলেও নিতুম। মায়ের সরল প্রাণে কি দাগ কেটে গেল বল দিকিনি। মাকে কি বোঝাই? তোমার ওপর একটা খারাপ ধারণা হয়ে গেল।

রিনি কোনো জবাব দিতে পারেনি। মাথা নীচু করে চুপ করে বসেছিল। দুদিন ধরে মুখার্জীর সঙ্গে, মায়েব সঙ্গে মুখ তুলে কথা বলে নি।

তিনদিনের দিন আফিং জোগাড় করে আনিয়ে খেয়েছিল রিনি—জীবন শেষ করবার জন্যে। দেবতার মতো মামা—স্বামী—শাশুড়িকে কলঙ্ক থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। চিঠিতে লিখেছিল সে সম্পূর্ণ মিথ্যে—একথা মুখে বলতে বাধে, তাই বলেনি সে।

মরণ তার হল না। হলে ভালো হত। মুখার্জীর অভিনয় হলেও তখন রিনির কাছে ও দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত এ ভাব না দেখে, ওই ভাবটা নিয়ে মরলে—সে মরণ শান্তির হত। কিন্তু এ মরণে অশান্তি।

মুখার্জী এসে পড়ল বাড়িতে। তাকে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হয়। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে রিনির অচৈতন্য দেহ দেখে, চিঠি পড়ে বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে না ওর।

হাসপাতালে নিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। পাম্প করে বিষ বার করে বাঁচিয়ে তোলে রিনিকে।

তারপর—তারপর থেকে কোনো দিন কাছ ছাড়া করেনি মুখার্জী।

বাইরে কাজে গেলেও রিনিকে ছাড়ত না।

মুখার্জীর মায়েরও তাই আদেশ ছিল! কৃষ্ণেশ! বৌমাকে ছাড়িস না! ও বড় অভিমানী। বাব্বা! আমাদের ছেড়ে পালাবার মতলব করেছিল!

রিনি কেমন ভাবতে পারে কৃষ্ণেশকে—ও তাকে ভালোবসেনি? বেসেছিল প্রাণ দিয়ে। সে ভালোবাসা সাঁওলী কেড়ে নিয়েছে!

রিনি পাগলের মতো দৌড়ে বেরিয়ে আসে তাঁবুর বাইরে। কৃষ্ণেশের হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ভেতরে। রাইফেলটা কৃষ্ণেশের হাতে দিয়ে বললে—মুখার্জী, নিজে বাঁচিয়েছ, নিজেই শেষ কর! তুমি তো আমার সবই জান। বাবার পার্বতীর মতো, তোমার সাঁওলী এসে জুটেছে—এ আমার অদৃষ্টের ফের।

কৃষ্ণেশ রিনির কথা শুনে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। রিনির বাপের চরিত্র—মায়ের দুর্ভোগ এত প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে ওর মনে?

রিনিকে বাঁচাতে হলে এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। সাঁওলীর নাম উচ্চারণ করলে রিনির ব্যারাম সারান যাবে না!

রিনির হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিলে কৃষ্ণেশ। শান্ত গলায় বলল—কাল টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি হেড অফিসে। তোমার শরীর খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে এখানে। পরশু রওনা হব আমরা।

রিনি বিশ্বাস করতে পারল না কৃষ্ণেশকে। রিনির সদাই ভয়—তার সুখ সয় না। সুখ শুরু হলেই দুঃখের ছায়া তার পেছনে লাগবে নিশ্চয়ই। যাওয়ার কথা অনেক শুনেছে সে।

এ কথাটাকে সত্যি বলে মেনে নিতে তার মন চাইছে না। ভাঁওতা মনে হচ্ছে।

রিনির মুখে কোনো খুশীর লক্ষণ দেখতে পেলে না কৃষ্ণেশ। কেবল ওর অবাক দৃষ্টি লক্ষ্য করতে লাগল অপলক চোখে।

নিশুতি রাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আসা যাওয়া চলতে লাগল। চমক ভাঙা ঘুমের উৎপাত চলল রাত ভোর।

—এতদিন কাটল—কালকের দিনটা বইতো নয়! দেখাই যাক না ভাগ্য-দেবতার মর্জিটা! এই চিন্তাই তালগোল পাকাচ্ছে রিনির মাথার ভেতর।

দুশ্চিন্তায় রাত কাটল।

ভোরের আকাশে আলো ছড়িয়ে পড়ল। সুর্য উঁকি মারল। গাছের মগডালে পাখির দলের ওড়াউড়ির ধুম পড়ে গেল। স্নিগ্ধ হাওয়ার ছোঁয়া লাগল পাহাড় মাটির বুকে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে উৎকণ্ঠা বাড়তে লাগল রিনির। কৃষ্ণেশের মুখের দিকে ঘন ঘন নির্বাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে ধরলে লাগল।

ট্রাক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল কৃষ্ণেশ। টেলিগ্রামের রসিদ নিয়ে খানিক পর ফিরে এল তাঁবুতে।

রসিদ দেখে, বিস্ময়-আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ল রিনি। রিনির মুখে হাসির রেখায় কৃষ্ণেশও উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

বাজিয়া এল। বাবুর চলে যাবার সংবাদে বিমর্ষ হয়ে পড়ল খুব। পাহাড়ি চোখে—বুনো চোখে ভেসে উঠল বাঁধন হারা আকুতি। বাবু চলে যাবে—এ ধারণার বাইরে! বাবু তাদের ছেড়ে যেতে পারে? বাজিয়ার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল।

কৃষ্ণেশ বলল—দুঃখু করিসনে বাজিয়া। কাজ বাকি রইল এখনো। আবার আসব।

বাজিয়া সাঁওলীকে সব বলল—ডেরায় ফিরে। সাঁওলীর যেন একটা ফুসফুস দু'টুকরো করে কেটে ফেলল। ক্ষেপে উঠল সাঁওলী। কালকের নিয়ে আসা কাপড়ের পুঁটলিটায় পর পর লাথি মারতে লাগল। পুঁটলিটা পায়ে করে ছুঁড়ে মারল বাজিয়ার দিকে—নিয়ে যা! ফিরিয়ে দিয়ে আয় তোর পেয়ারের বাবুকে। বলে আয়, আর যেন জীবনে না আসে এখানে!

গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করল সাঁওলী—রিনিমা যাচ্ছে?

—হ্যাঁ।

—কালই?

—সেই রকম শুনলুম।

—রিনিমার খুব ফুর্তি দেখলি বুঝি?

—হ্যাঁ খুব হাসি খুশী ভাব।

সাঁওলী দপ-দপিয়ে বেরিয়ে গেল ডেরা থেকে। নিষ্ফলা আম-গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বকবক করতে লাগল।

—বাবু চলে যাচ্ছে—তাকে ছেড়ে! পারত না—কিছুতেই না। রিনিমার জন্যেই চলে যাচ্ছে বাবু। রিনিমা চায়না বাবু তাদের সঙ্গে মিশুক—এখানে থাকুক। সাঁওলীর কাজশুদ্ধ বন্ধ করেছিল ওই রিনিমাই!

সাঁওলী মতলব ভাঁজতে থাকে। রিনিমাকে সরাতে পারলে খুন করলে—মেরে ফেললে বাবু যাবে না। এখানেই থেকে যাবে! তারই হয়ে থাকবে সারা জীবন।

সাঁওলীর চোখের কোণে দুষ্টমি ভরা হাসিক ঝিলিক মেরে যায়। আজ রাত দুপুরে—

নিঝুম নিশুতি রাত।

অগাধে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে বাজিয়া। নিঃশ্বাসে ফোঁস ফোঁস আওয়াজের বিরতি ঘটছে মাঝে মাঝে। বাজিয়া যেন সাঁওলীর মনের কথা বুঝতে পারছে সব। এ তার কপট নিদ্রা। সাঁওলী এক দৃষ্টে চেয়ে আছে বাজিয়ার মুখের দিকে—চোখের দিকে। পাতা চাপা চোখের তারা এপাশে ওপাশে ঘুরছে না!

বাজিয়ার গা ঘেঁষে সরে বসল সাঁওলী। বাজিয়াকে ধাক্কা মারল। ইচ্ছে করেই ধাক্কা মারল সাঁওলী ঘুমটা পরখ করবার জন্যে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাঁওলী। নিশ্চিন্ত হল—উদ্বেগ কমল। বাজিয়া মরণ ঘুম ঘুমুচ্ছে, যেমন রোজ ঘুমোয়। শুধু তার মনের ভ্রম—ভয় হয়ে ঘুরছে সামনে।

অতি সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল সাঁওলী। পা টিপে টিপে ঝোলান টাঙিটার কাছে এসে থমকে গেল। ফিরে চাইল বাজিয়ার দিকে। রুদ্ধশ্বাসে পেড়ে নিলে টাঙিটা।

এক পা এক পা করে, পেছু ফিরে দেখতে দেখতে নিঃশব্দে ডেরা থেকে বেরিয়ে এল।

অন্ধকারের বুকে উন্মত্ত সাঁওলী রণরঙ্গিনী মূর্তিতে ছুটে চলছে কৃষ্ণেশের তাঁবুর দিকে।

সাঁওলীর উসখুস্নুনি ভাবে সংশয় জেগে ছিল বাজিয়ার মনে। শোবার পর থেকেই সাঁওলী একটা অস্বস্তি অনুভব করছিল। তার নিজের অগোচরেই উঠেছিল বসেছিল—কি যেন করতে চাইছে সে। চাপা আগুন মাঝে মাঝে দপদপ করে জ্বলে উঠছে বেশ বোঝা যাচ্ছে—দু'একটা ঘুষি মাটিতেই ছুঁড়ল দুম দুম করে।

সাঁওলীর যে একটা কিছু হয়েছে—এবিষয়ে নিঃসন্দেহ। বাজিয়া গভীর নিদ্রার ভান করে মটকা মেরে পড়ে রইল—সাঁওলী কি করে দেখা যাক, টাঙি হাতে করাতে ভেবেছিল বাজিয়া—বাহাদুরকে মারবার জন্যে প্রতিশোধ নেবার জন্যে সাঁওলীর মন পাগল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাহাদুর তো নেই। বাবু তাকে সাজা দিয়েছে—। সাঁওলী তাতে খুশী। বাজিয়ার কাছে নিজেই স্বীকার করেছে, হারামিকে খুব বকেছে রে বাজিয়া, তাড়িয়ে দিল ঘাড় ধরে বাবু। দেখ, দেখ! পাঁচ টাকা—হাণ্ডিয়া খাব! কত কাপড় জামা! তবে কি জিতোকে খুন করব! জিতো আবার দিক করছে, জ্বালাচ্ছে হয়তো ওকে—কিন্তু জিতো তো হেরে গিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে—এ তল্লাটের ত্রিসীমানায় নেই। কি জানি, আবার এসে থাকবে। জানতে পেরেছে সাঁওলী একলা পারবে না। বাজিয়ারও যাওয়া উচিত।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল বাজিয়া। ওর টাঙিটা পেড়ে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। ততক্ষণে সাঁওলী অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দিক-বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে হনহনিয়ে চলেছে সাঁওলী। কোনো দিকে লক্ষ্য নেই তার। সে জানে প্রকৃতির বুকে সবাই ঘুমন্ত। এক সে ছাড়া, তার বুকের রক্তের নাচুনি ছাড়া, কেউ জেগে নেই। কেউ জানতে পারবে না, কেউ ধরতে পারবে না। নিঃসাড়ে কাজ সেরে ফিরে এসে প্রাণ ভরে ঘুমুবে সাঁওলী।

কালকের ভোর হবে সাঁওলীর জীবনে নতুন ভোর। সুখের জন্ম। সাঁওলীর নিজে হাতে সৃষ্টি করা সুখে নিজেই মশগুল হয়ে থাকবে দিনরাত।

বাজিয়ার বুক দুর দুর করে ওঠে।—তাঁবুর দিকে কেন? সাঁওলীর কি মাথা খারাপ হল নাকি! শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল বাজিয়া। সাঁওলীর কাছ বরাবর এসে পৌছল।

তাঁবুর চারপাশ নিশ্চিন্ত পুরী। জন-প্রাণী নেই। ভেতরে ক্লেশ রিনি চাকর-বেয়ারা। দুটো কাপড়ের কামরা করা। একটা চাকর বাকরদের—অন্যটি মালিকদের। পাহারা দেবার কেউ নেই, সকলে ঘুমে কাতর। যে পাহারা দেবার ছিল, সেও নেই বাহাদুর রাঁধুনি হলেও, দারোয়ানিও করত—অবিশ্যি সেটা তার ভালো লাগত। সারাদিন খেটে-খুটে রাত্তিরে বসে বাঁশি বাজাবে। ঘুম এলেও মাঝে মাঝে অভ্যাসের দরুন—কৌন হ্যায় কৌন হ্যায় করবে।

বরাবরের জন্যে মুখ বন্ধ হয়ে গেছে বাহাদুরের। পাহারা দেওয়াও ঘুচে গেছে—ব্যাটা শায়েস্তা হয়েছে। এইবার—। সাঁওলী হাসল। যেন অন্ধকারের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। ধীর পায়ে তাঁবুতে প্রবেশ করল। পেছনে পেছনে বাজিয়াও। বাজিয়া নিঃশ্বাস বন্ধ করে রয়েছে—যদি ওর নিঃশ্বাসের ছোঁয়ায় সাঁওলী সচেতন হয়ে ওঠে! বিস্ময়ে-ডোবা বাজিয়ার উৎসুক মন সাঁওলীকে আলতো ভাবে ঘিরে ধরেছে।

প্রতিদিনের জানা-চেনা-দেখা জায়গায় চলাফেরা করতে, অন্ধকারে একটুও অসুবিধে হল না সাঁওলীর। বেশ সহজ গতিতে পা চেপে চেপে চুপিসাড়ে এসে দাঁড়াল রিনির মাথার কাছে। দিনে রাতে মানসিক উৎকণ্ঠা ভোগ করে করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে রিনি। দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ আগে অবধি অস্থির হয়ে পড়েছিল দুর্ভাবনার গোমরানিতে! টেলিগ্রাম—রসিদ—তবুও বিশ্বাস হয় না—যতক্ষণ না নির্বিঘ্নে মুখার্জীকে নিয়ে কলকাতায় পৌছয় রিনি! কি জানি, কি অঘটন ঘটে—তার বরাত যা ভাঙা!

ভাবতে ভাবতে অবসন্ন মনটা নিস্তেজ হয়ে এসেছে রিনির। চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে উঠেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে রিনি।

সাঁওলীর গরল-ওথলানো উত্তপ্ত নিঃশ্বাস দ্রুত পড়তে লাগল। রিনি স্বপ্ন দেখছে—তার মাথার কাছে বিষধর সাপ ফণা তুলে ফোঁস-ফোঁস করছে, দংশনের তাক খুঁজছে। রিনির গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বুকের ভেতর হাঁকু-পাঁকু করছে—কথা বলতে চেষ্টা করছে—জিভ ভেতর দিকে টানছে! অতিকষ্টে ডাকছে—মুখার্জী! বাঁচাও! মুখার্জীর কানে সে আওয়াজ যাচ্ছে না মোটে। রিনি ঘুমের ঘোরে নড়ে উঠল।

সাঁওলী তাক খুঁজছে। টাঙি উঁচিয়ে ধরেছে, রিনির গলার ওপর বসিয়ে দেবে সজোরে।

—আর দেরি। নড়ছে। জেগে উঠতে পারে। এ ঘুম ভাঙতে দেওয়া হবে না।

সাঁওলীর হাতের টাঙি নেমে আসছে রিনির গলার ওপর। সাঁওলী চমকে, ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল। বাজিয়া ওর হাত দুটো বজ্র মুষ্টিতে পেছনের দিকে টেনে ধরেছে। টাঙি মাঝ পথেই আটকে গেছে—নামতে পারেনি।

সাঁওলীর চিৎকারে কৃষ্ণেশ-রিনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। পাশ থেকে ছুটে এল বেয়ারা চাকর।

টর্চের আলোয়, সাঁওলী বাজিয়াকে টাঙি হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, কৃষ্ণেশ হতভম্ব হয়ে গেল। রাইফেল তুলে নিল হাতে! ঘৃণা ছুঁড়ে মারলে ওদের মুখের ওপর।—ছিঃ! তোদের ভাই-বোনের মতো দেখেছি এতদিন—সে বিশ্বাসটা ভেঙে দিলি! আমাদের খুন করতে এলি যাবার আগে!

কাঁপা গলায় বললে বাজিয়া—বাবু তমমানকু মারিবারো নাহি, সাপ মারিবারো আসি থিবারো।—ভুল বুঝবেন না বাবু! বিষাক্ত সাপ আসছিল তাঁবুর দিকে। আমাদের খুবরির ধারেই ঘুরছিল, ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করছিল সাপটা। সাঁওলী আমি দুজনে মারতে

বেরুই। সাপটা ছুটে আসতে থাকে তাঁবুর দিকে! আমরা ওর পেছু নিই। এর ভেতর মায়ের মাথার দিকে আসতেই, মাকে বাঁচাবার জন্যে সাঁওলী সাপ মাথার দিকে আসতেই, মাকে বাঁচাবার জন্যে সাঁওলী সাপ মারতে টাঙি তুলতেই, সাপটা মাথা নিচু করে পালিয়ে যায়। চিৎকার করে ওঠে সাঁওলী।

হাতের রাইফেল নামিয়ে রাখে মুখার্জী! কৃতজ্ঞতার জলে রিনির চোখ দুটো ভরে ওঠে। আবেগ চাপতে না পেরে নিজের গলার হার সাঁওলীর গলায় পরিয়ে দিয়ে, ওকে নিবিড় করে বুকে চেপে ধরে রিনি —সাঁওলীর যদি মুখার্জীকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেবার ইচ্ছে থাকত- সে সুযোগ এসেছিল। সাপের বিষে তার মৃত্যু হত এখুনি। কিন্তু তাকে মরতে দেয় নি সাঁওলী। বাঁচাল- জীবন দিল। সাঁওলীর ঋণ শোধ করতে পারবে না কখনো সে।

কৃষ্ণেশ হাতের আংটি খুলে দিল বাজিয়াকে।—বাজিয়া, আজ রিনির জীবন দান করলি তোরা!

সাঁওলীর চোখে বিস্ময়।—বাজিয়া কত ভালোবাসে তাকে! কি ভাবে ইজ্জত রাখল! রিনিমা কত ভালো! রিনিমা বেঁচেছে—বাবুর কি আনন্দ। রিনিমা ছাড়া বাবু বাঁচতে পারবে না। রিনিমা বলে বাবুকে আটকান যেত না। পেত না বাবুকে সাঁওলী! কি ভুল করেছিল সে!

বাজিয়া-সাঁওলী তাঁবুতেই রয়ে গেল সারা রাত। কৃষ্ণেশ-রিনি অনেক ফেরাবার চেষ্টা করেছিল ডেরায়। ওরা বলেছে—তাদের দেব-দেবী চলে যাচ্ছে সকালে। যাবার আগে পর্যন্ত একটু কাছে থাকতে দেওয়া হক, সেবা করতে দেওয়া হক মেহেরবানি করে। আপত্তি করেনি রিনি-কৃষ্ণেশ।

বাকি রাতটুকু—বাজিয়া-সাঁওলী নিজেরাই তৎপর হয়ে জিনিস-পত্র বাঁধাবাঁধি গোছানয় ব্যস্ত হয়ে রইল। তাদের বাবা-মা যাচ্ছে—নিশ্চিন্ত হয়ে কি ঘুমুতে পারে তারা?

ভোর হল। ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল। রাতের অন্ধকারের

কবল থেকে মুক্তি পেল প্রকৃতি। আকাশ ছেয়ে আলোর ঝর্ণা নামতে লাগল ধীরে ধীরে।

তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ট্রাক। যাত্রা শুরুর অপেক্ষায় ক্ষণ গুনছে। অনিচ্ছুক হাতে মাল-পত্র তুলে দিল ট্রাকে বাজিয়া-সাঁওলী। সজল চোখে ওরা, ওদের দেব-দেবীকে ট্রাকে উঠিয়ে দিল। দেবতাকে বিসর্জন দিল নিজেরা হাতে করে। হাহাকারে ভরে উঠল ওদের অন্তর। বাজিয়া-সাঁওলীর চোখে কান্নার বন্যা ছুটল।

আত্মীয়বিয়োগ ব্যথায় রিনি-কৃষ্ণেশের চোখের কোণও চিক চিক করে উঠল। কান্না-ভেজা গলায় বলল রিনি—তোদের ভুলতে পারব না। বাবুর সঙ্গে আবার আসব। কাজ বাকি রইল—

———